ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

একাদশ খণ্ড

25 YEARS
TOGETHER AGAINST CORRUPTION

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

একাদশ খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়
(২০২০ সালে প্রকাশিত টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংকলন)

একাদশ খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২১

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০২১

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবির।

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গবেষণার উপদেষ্টা

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা-নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

প্রচ্ছদ অলংকরণ
বরকত উল্লাহ বাবু

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরোনো ২৭)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন : ৮৮০-২-৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৪৮১১৩১০১
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org

ISBN: 978-984-34-9992-9

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়
শুদ্ধাচারব্যবস্থা

পার্লামেন্ট ওয়াচ : একাদশ জাতীয় সংসদ (প্রথম থেকে পঞ্চম অধিবেশন) **১৫**
মোরশেদা আক্তার ও নিহার রঞ্জন রায়

দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ : বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর একটি ফলোআপ গবেষণা **৩৩**
শাহজাদা এম আকরাম ও শাম্মী লায়লা ইসলাম

ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় **৪৭**
মো. জুলকারনাইন, অমিত সরকার ও মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

সংসদীয় আসনভিত্তিক থোক বরাদ্দ : অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ **৭১**
জুলিয়েট রোজেটি

সরকারি ক্রয়ে সুশাসন : বাংলাদেশে ই-জিপির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ **৮৯**
শাহজাদা এম আকরাম, নাহিদ শারমীন ও মো. শহিদুল ইসলাম

দ্বিতীয় অধ্যায়
সেবা খাত

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় **১০৯**
ফাতেমা আফরোজ ও ফারহানা রহমান

নিমতলী, চুড়িহাট্টা এবং অতঃপর : পুরানো ঢাকার অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ১২৭
মো. মোস্তফা কামাল ও আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া

করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ১৪৩
মো. জুলকারনাইন, মোরশেদা আক্তার, তাসলিমা আকতার ও মনজুর ই খোদা

তৃতীয় অধ্যায়
ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত

বাংলাদেশে বিদেশিদের কর্মসংস্থান : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১৬৭
মনজুর ই খোদা

গবেষক পরিচিতি ১৮১

মুখবন্ধ

২০২০ সাল আমাদের দেশ ও সারা বিশ্বের জন্যই নতুন নতুন সংকট নিয়ে এসেছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীন দেশের উহান থেকে শুরু হয়ে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে অতিস্বল্প সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে একটি প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ কোভিড-১৯। ২০২০ সালের ৩০ জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাস সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করে এবং পরবর্তী সময়ে মহামারি বা অতিমারি (pandemic) হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশে মার্চ মাসের শুরুর দিকে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়, যা বর্তমানে দেশের অন্যতম একটি স্বাস্থ্য সমস্যা এবং দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ার কারণে বাংলাদেশে এই রোগের ঝুঁকি আরও বেশি। এ ছাড়া এ বছর শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আম্পান আঘাত হানে যার প্রভাব ছিল আগের অন্য যেকোনো ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে বিস্তৃত। সারা বছর কয়েক দফা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এ সবকিছুই বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকায় মারাত্মক সংকট তৈরি করেছে। এর পাশাপাশি দেশে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির গভীরতা এসব সংকটের কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও উন্মোচিত হয়েছে।

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নাগরিক চাহিদাকে সোচ্চার ও কার্যকর করার জন্য কাজ করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য টিআইবি গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোতে প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক অবকাঠামো সুদৃঢ় করা ও এর প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক ১০টি সংকলন ইতিমধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের একাদশতম সংকলন ২০২১ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। এই সংকলনকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে– প্রথম অধ্যায়ে দেশের শুদ্ধাচারব্যবস্থা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার ওপর ভিত্তি করে লিখিত সারসংক্ষেপ ও প্রবন্ধসমূহ সংকলিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধে শুদ্ধাচারব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে পঞ্চম অধিবেশনের ওপর টিআইবির নিয়মিত পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণা 'পার্লামেন্ট ওয়াচ'-এর সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত

হয় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী দলীয় সরকারের অধীনে। তবে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব এবং সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ও বৈষম্যমূলক অবস্থানের কারণে প্রশ্নবিদ্ধ এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (৮৯ শতাংশ আসন) নিয়ে সরকার গঠন করে। দশম সংসদের মতো এই সংসদেও নির্বাচনকালীন মহাজোটের একটি দল নিয়মরক্ষার প্রধান বিরোধী দল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

গবেষণায় দেখা যায়, সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমে বিশেষত আইন প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা জোরদার হয়েছে। অন্যদিকে আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ, সংসদীয় কমিটির অকার্যকারিতা ও সংসদীয় উন্মুক্ততার ক্ষেত্রে ঘাটতি, কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি প্রভৃতি কারণে অনেকটাই কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। পূর্ববর্তী সংসদগুলোর মতো একাদশ সংসদেও স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে অনীহা লক্ষণীয় ছিল। সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা এবং নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ থাকলেও সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্পিকারের জোরালো ভূমিকার অনুপস্থিতি ছিল। সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম, বিশেষ করে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ছিল লক্ষণীয়। এ ছাড়া নিয়মরক্ষার প্রধান বিরোধী দল হওয়ায় সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে দলটি যেমন প্রত্যাশিত শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি, তেমনি সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদ কার্যকর করাসংক্রান্ত অঙ্গীকারের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নও দেখা যায়নি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর একটি ফলোআপ গবেষণার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় ছয়টি ক্ষেত্রের অধীনে ৫০টি নির্দেশকে দুদকের সক্ষমতা ও কার্যক্রমের ওপর স্কোর দেওয়া হয়। দেখা যায় দুদকের প্রধান দুটি ম্যান্ডেটের মধ্যে প্রতিরোধকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে দুর্নীতি দমন দুর্বল হয়েছে। দুদকের শক্তিশালী দিকগুলো হচ্ছে এর প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, কাজের আওতা, আইনি স্বাধীনতা, কমিশনারদের নিয়োগ ও অপসারণের বিষয়, বাজেটের পর্যাপ্ততা, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা, স্থায়ী কর্মী বাহিনী, নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ, তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান, নিজেদের কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে অভিগম্যতা, স্বপ্রণোদিত তদন্ত, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার সক্ষমতা ও ইচ্ছা, শক্তিশালী প্রতিরোধ, শিক্ষা ও বহির্মুখী কার্যক্রম, অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। তবে দুদকের দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে জাতীয় বাজেটের তুলনায় অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ, বাহ্যিক

কোনো পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা না থাকা, যথাযথভাবে প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা, দুর্নীতির অভিযোগের সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা, অভিযোগ দায়েরের হারের তুলনায় মামলা দায়েরের কম হার, নারী, দরিদ্রসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা মেটানোর কোনো কাঠামো না থাকা এবং সার্বিকভাবে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের ধারণা খুব আশাব্যঞ্জক না থাকা, যা আস্থাহীনতাকেই নির্দেশ করে। এ ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুদকের কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেন, দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্যমান।

তৃতীয় প্রবন্ধে ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হলেও রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি, ব্যবসায়ীদের প্রভাবে ব্যাংক তদারকি কার্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব, আইনগত সীমাবদ্ধতা, তদারকি কার্যক্রমে সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি এবং অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রমশ অবনমন ঘটেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি এবং রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপের কারণে ব্যাংকিং খাতে আইনের লঙ্ঘন ও অনিয়ম-দুর্নীতির মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, দুর্বৃত্তায়ন, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংক থেকে আমানতকারীদের হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ হিসেবে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের দখলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খেলাপি ঋণ আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণখেলাপিদের অনুকূলে বারবার আইন সংশোধন ও নীতি প্রণয়ন ব্যাংকিং খাতকে ঋণখেলাপিবান্ধব করছে এবং খেলাপি ঋণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করছে, যা এমনকি নিয়মিত ঋণগ্রহীতাকেও খেলাপি হতে উৎসাহিত করছে। খেলাপি ঋণ অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ ও বিদেশে পাচার হচ্ছে, যা জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে ব্যাংকিং খাতের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকাকে ব্যাহত করছে। তবে ব্যাংক খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত কিছু সংস্কার ও তার কার্যকর প্রয়োগ ব্যাংকিং খাতের এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি হতে উত্তরণে সহায়ক হবে।

চতুর্থ প্রবন্ধে সংসদীয় আসনভিত্তিক থোক বরাদ্দের অধীনে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদে আইন প্রণয়ন করা, নিজ এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা সংসদ সদস্যদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এ ছাড়া আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সংসদ সদস্যের মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও সুযোগ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 'পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে'র আওতায় নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের মতে, এলাকার জন্য পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত স্কিমগুলো সার্বিকভাবে উপযোগী বিবেচিত হলেও স্কিম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পারস্পরিক সুবিধার

সমঝোতা সম্পর্ক এবং কমিশন-বাণিজ্যের ফলে স্কিমের কাজের মান প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়। এ ছাড়া তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সদস্যদের একাংশ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন অনিয়মকে প্রশ্রয় দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ। এই প্রকল্প সংসদ সদস্যের একাংশের জন্য স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার চর্চা, নির্বাচনে ভোট নিশ্চিত করার চেষ্টা ও অনৈতিকভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাজ চলাকালে এর অগ্রগতি তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্যদের উদ্যোগ নিতে দেখা গেলেও এই প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট নীতিকাঠামো, কৌশলের ঘাটতিসহ আসনভিত্তিক স্কিম সম্পর্কিত তথ্য এবং প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুপস্থিত। সার্বিকভাবে কার্যকর তদারকি, প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়ন এবং সংসদ সদস্যের নৈতিক আচরণ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিধির অনুপস্থিতি উন্নয়নের দলীয়করণ এবং অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে উৎসাহিত করছে।

এ অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধে বাংলাদেশে সরকারি ক্রয়ে ই-জিপির কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে সব সরকারি পরিষেবা ডিজিটাল করার সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১১ সালের ২ জুন থেকে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে সিপিটিইউর তত্ত্বাবধানে ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (সংক্ষেপে ই-জিপি) শুরু করা হয়। প্রাথমিকভাবে চারটি প্রতিষ্ঠান- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ (সওজ), পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে (আরইবি) ই-জিপি বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে সরকারি প্রায় সব প্রতিষ্ঠান ই-জিপির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। ই-জিপি বাস্তবায়নকারী প্রথমদিকের প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর ২০টি নির্দেশকের অধীনে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখা যায় সরকারি ক্রয়ে ই-জিপির প্রবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও এখনো সব প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয়ে এর ব্যবহার হচ্ছে না। দুর্নীতি হ্রাস ও কাজের মানের ওপর ই-জিপির কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না। ক্রয়-প্রক্রিয়া সহজতর হলেও একদিকে কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ, সিন্ডিকেট এখনো কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে, অন্যদিকে এর পাশাপাশি কার্যাদেশ বিক্রি, অবৈধ সাব-কন্ট্রাক্ট, কাজ ভাগাভাগির কারণে কাজের মানের ওপর কোনো ইতিবাচক প্রভাব নেই। ই-জিপি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো কোনো কোনো কাজে ম্যানুয়াল পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল, ফলে ই-জিপির মূল উদ্দেশ্য– দরপত্র-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন, অনেকখানি ব্যাহত হচ্ছে। বলা যায় ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে ম্যানুয়াল থেকে কারিগরি পর্যায়ে সরকারি ক্রয়ের উত্তরণ ঘটলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একাংশ দুর্নীতির নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে। তবে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ ঘটলে ই-জিপির সুফল পুরোপুরি পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

সেবা খাত বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজউকের সেবার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উভয় স্তরেই দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান। রাজউকে নিয়ন্ত্রণমূলক কাজকে গুরুত্ব না দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজে অধিক গুরুত্বারোপ করা এবং আবাসন ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অন্যদিকে পরিকল্পনা প্রণয়ন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও তা বরাবর উপেক্ষিত থেকে গেছে। রাজউকের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র, নকশা অনুমোদন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এসব সেবা ও এ-সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানে সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি এবং তাদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করা হয়। দুর্নীতির ক্ষেত্রে রাজউক কর্মকর্তা ও দালাল, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (যেমন প্রকৌশলী ও নকশাবিদ, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার ইত্যাদি) এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আঁতাত স্পষ্ট। ফলে রাজউক কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন ব্যাহত হচ্ছে। এ ছাড়া ঢাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানিনিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা রোধ করে ঢাকাকে অধিক বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে ড্যাপ সংশোধনী কার্যক্রম পরিচালিত হলেও এ বিষয়গুলো গুরুত্ব না দেওয়া এবং এ ক্ষেত্রে সংবেদনশীল ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। রাজউক ক্ষমতার অপব্যবহার করে ড্যাপ পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ উপেক্ষা করে বন্যা বা উপবন্যা প্রবাহ অঞ্চলে হাউজিং প্রকল্প গ্রহণ করলেও এ ব্যাপারে জবাবদিহি না থাকা, রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বারবার ড্যাপ সংশোধন এবং সংশোধন অব্যাহত থাকায় ড্যাপ চূড়ান্তকরণে দীর্ঘসূত্রতা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যা ও দুর্নীতির পেছনে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও জন-অংশগ্রহণের ঘাটতি, আইনি সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব এবং অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার।

পুরানো ঢাকার অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় প্রবন্ধে। ঢাকা মহানগরীতে অগ্নিকাণ্ড একটি ঘন ঘন সংঘটিত ভয়াবহ দুর্যোগ। মহানগরীর বর্তমান ৪৯টি থানার মধ্যে পুরানো ঢাকায় অবস্থিত আটটি থানার আওতাধীন এলাকাগুলোতে এ প্রবণতা আরও ভয়াবহ। পুরানো ঢাকায় সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহতম অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড অন্যতম। ২০১০ সালের ৩ জুন রাতে নিমতলীর অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১২৪ জন এবং ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে চকবাজারের চুড়িহাট্টার আগুনে আবারও অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৭০ জন মৃত্যুবরণ করেন এবং উভয় ঘটনায় কয়েক শ মানুষ আহত হন। গবেষণায় দেখা যায়, সুশাসনের ঘাটতির কারণে পুরানো ঢাকায় নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা প্রতিপালন না করার পাশাপাশি আদালতের অবমাননাও করেছে। পুরানো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির কারণে বাস্তবের মুখ দেখতে ব্যর্থ। কতিপয় প্রভাবশালীর

অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে রাসায়নিক ও দাহ্যপদার্থের গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখা হয়েছে। দ্রুত অগ্নিনির্বাপণের জন্য পুরানো ঢাকায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ ছাড়া অগ্নি-দুর্ঘটনাকে দুর্যোগ হিসেবে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় বাজেট ও পরিকল্পনাও নেই। একই প্রবণতার কারণে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানকেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো নীতিমালা এখন পর্যন্ত তৈরি করা হয়নি এবং অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্যতার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার প্রবণতাও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ের অভাবে অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি ও দীর্ঘসূত্রতা বিদ্যমান, যার ফলে সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে। সার্বিকভাবে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে অংশগ্রহণ ও সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ না থাকলে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

করোনাভাইরাস ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করলেও তার বাস্তবায়ন কতটুকু কার্যকর হচ্ছে এবং কার্যকর না হলে কেন হচ্ছে না, এ ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতিগুলো কী কী, এই অভূতপূর্ব দুর্যোগ মোকাবিলায় গৃহীত বহুমুখী কার্যক্রম সরকারের ঘোষিত অঙ্গীকার অনুযায়ী কতটুকু দুর্নীতিমুক্তভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় কী তা চিহ্নিত করার প্রয়োজন থেকে একটি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়, যার উল্লেখযোগ্য ফলাফল এই অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। দীর্ঘসময় ধরে পরিকল্পনাহীনতা, সুশাসনের ঘাটতি ও অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের কারণে স্বাস্থ্য খাতের দুর্বল সক্ষমতা করোনার সংকটে উন্মোচিত হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি প্রকটভাবে লক্ষ করা গেছে। চীন দেশে করোনার প্রাদুর্ভাবের পর তিন মাস সময় হাতে পেয়েও করোনাভাইরাস মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ না করায় এবং সুশাসনের ঘাটতির কারণে দেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। একদিকে প্রস্তুতিহীনতা, সমন্বয়হীনতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে করোনাভাইরাস আক্রান্তের অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, অন্যদিকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষাগারের সম্প্রসারণ না করে বিপুলসংখ্যক মানুষকে পরীক্ষার আওতার বাইরে রাখা এবং কঠোরভাবে চলাচল নিয়ন্ত্রণ না করার কারণে সংক্রমণ সারা বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। লকডাউনসহ সব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে আমলানির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। স্বাস্থ্য খাতের ক্রয়ে দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণের জন্য করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ব্যাপক সামাজিক সম্পৃক্ততা বা অংশগ্রহণের অভাব এবং মাঠপর্যায়ে করোনা সম্পর্কিত তথ্য প্রচারণায় ঘাটতির কারণে জনসাধারণে মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয় এবং কোয়ারেন্টাইন ও লকডাউনব্যবস্থা অকার্যকর

হয়ে পড়ে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণ এবং মাঠপর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রণোদনা প্রকল্পগুলো একদিকে ব্যবসায়ীবান্ধব ও ঋণভিত্তিক এবং অন্যদিকে অতিদরিদ্রদের জন্য এই আর্থিক সহায়তা অপ্রতুল। ঋণখেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ তৈরির কারণে এই প্রণোদনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করা এবং দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় না নিয়ে এসে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীকে হয়রানি ও নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রবণতা লক্ষ করা গেছে, তা প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে উৎসাহ দিয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের ওপর একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশে বিদেশিদের কর্মসংস্থানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধে দেখা যায়, বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশি কর্মীর সংখ্যা, দেশ থেকে অবৈধভাবে পাঠানো রেমিট্যান্স ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে বিদেশি কর্মী নিয়োগে কোনো সমন্বিত ও কার্যকর কৌশলগত নীতিমালা নেই। বাংলাদেশে বিদেশি কর্মী নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। ফলে এসব বিদেশি কর্মী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়হীনতা বিদ্যমান। মাঠপর্যায়ে বিদেশি কর্মীর বৈধতা পরীক্ষণ ও নজরদারিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর তৎপরতা অনুপস্থিত। বিদেশি কর্মীর আগমন, প্রত্যাগমন ও নিয়োগ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আংশিকভাবে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ লক্ষণীয় এবং বিভিন্ন স্তরে নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। বিদেশি কর্মী নিয়োগের ফলে স্থানীয় প্রার্থীরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন এবং নির্দিষ্ট পদে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় বিদেশি কর্মী নিয়োগের কারণে বেতন-ভাতা বাবদ রাষ্ট্রের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয়। বিদেশি কর্মীর প্রকৃত সংখ্যা ও অবৈধভাবে পাচারকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য নেই। এই গবেষণার প্রাক্কলন অনুযায়ী, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীর ন্যূনতম সংখ্যা প্রায় ২ দশমিক ৫ লাখ, অবৈধভাবে পাচারকৃত রেমিট্যান্সের ন্যূনতম বার্ষিক পরিমাণ প্রায় ২৬ দশমিক ৪ হাজার কোটি টাকা এবং কর ফাঁকির কারণে ন্যূনতম বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা।

এ সংকলনের গ্রন্থনা ও সম্পাদনা টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরামের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকাশনাসংক্রান্ত কাজে বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশনস বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম এবং ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাসুম বিল্লাহ। তাদেরসহ অন্যান্য সব বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকর্মী যারা নিজস্ব অবস্থানে থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এ ছাড়া গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের

সব পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিশেষজ্ঞ ও অংশীজন, যারা তথ্য প্রদানসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সংকলনটি বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে আগ্রহী পাঠকের ভালো লাগবে, এই প্রত্যাশা করছি। এতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রবন্ধে মূল গবেষণাপ্রসূত সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে এবং যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে, টিআইবির এই প্রত্যাশা। পাঠকের মন্তব্য ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়

শুদ্ধাচারব্যবস্থা

পার্লামেন্ট ওয়াচ : একাদশ জাতীয় সংসদ (প্রথম-পঞ্চম অধিবেশন)*

মোরশেদা আক্তার ও নিহার রঞ্জন রায়

গবেষণার প্রেক্ষাপট

জাতীয় সংসদ জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম। সংসদের মূল কাজ আইন প্রণয়ন, জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ (১) ধারায় সুনির্দিষ্ট বিধান সাপেক্ষে সংসদকে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।[১] 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০'-এ সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে (লক্ষ্য ১৬.৬ ও ১৬.৭)।[২] 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ২০১২'-এ সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] এ ছাড়া বাংলাদেশ ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন[৪] এবং কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের[৫] সদস্য হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ দেশের শাসনব্যবস্থায় সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় দলীয় সরকারের অধীনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর। এই নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করলেও প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব এবং সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ও বৈষম্যমূলক অবস্থানের কারণে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (৮৯ শতাংশ আসন) নিয়ে সরকার গঠন করে। দশম সংসদের মতোই এই সংসদেও নির্বাচনকালে মহাজোটের একটি দল নিয়মরক্ষার বিরোধী দল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি একাদশ জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরু হয়।

বাংলাদেশে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং অধিপরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ

---

* ২০২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

হিসেবে একাদশ জাতীয় সংসদের ওপর এটি প্রথম প্রতিবেদন, যেখানে একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে পঞ্চম অধিবেশনের কার্যক্রম ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- একাদশ সংসদের প্রথম থেকে পঞ্চম অধিবেশনের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা; এবং
- সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

গবেষণাপদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংসদ টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড, অধিবেশন সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার। প্রথমে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে সংসদের কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রে কার্যদিবসসংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরামসংকট, সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াকআউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিশসংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, অনির্ধারিত আলোচনা, মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের আচরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের সামঞ্জস্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের তথ্যসূত্র থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই, প্রবন্ধ ও সংবাদপত্র।

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর সময়কালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে পঞ্চম অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক ও উপনির্দেশক

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক ও উপনির্দেশকগুলোর ভিত্তিতে যেসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ।

সারণি ১ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক ও উপনির্দেশক

মূল নির্দেশক	উপনির্দেশক
রাষ্ট্রপতির ভাষণ	• রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা।
আইন প্রণয়ন কার্যক্রম	• বিল উত্থাপন, আলোচনা (আপত্তি, সংশোধনী ও জনমত যাচাই-বাছাই); মন্ত্রীর বক্তব্য। • আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম : বাজেট (অর্থ আইন) আলোচনা।
জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম	• প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশের ওপর আলোচনা। • অনির্ধারিত আলোচনা। • সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরামসংকট। • সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম। • সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা।
সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	• সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা। • সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার।
সংসদীয় উন্মুক্ততা	• সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা।

মূল নির্দেশকের বাইরে দুটি বিষয় এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ‘জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত’-এর অধীনে সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা এবং বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারীর উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর অধীনে সংসদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার মূল পর্যবেক্ষণ

একাদশ সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার শরিক দলের ৮৯ শতাংশ আসন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টির ৭ শতাংশ আসন এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা রয়েছেন ৪ শতাংশ আসনে। সরাসরি নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে পুরুষ ৯২ শতাংশ ও নারী ৮ শতাংশ; সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে ৭৯ ও ২১ শতাংশ। উল্লেখ্য, সংসদে নারী সদস্যের হার সুইডেনে ৪৭, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৪৬, নেপালে ৩৩ ও যুক্তরাজ্যে ৩২ শতাংশ।[৬]

সারণি ২ : একাদশ সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ও আসনসংখ্যা

রাজনৈতিক দল	নির্বাচিত	সংরক্ষিত	মোট সংখ্যা (%)
সরকারি দল			
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৫৮	৪৩	৩০১ (৮৬%)
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৩	১	৪ (১.১৪%)
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	২	০	২ (০.৫৭%)
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২	০	২ (০.৫৭%)
তরিকত ফেডারেশন	১	০	১ (০.২৮%)
জাতীয় পার্টি-জেপি	১	০	১ (০.২৮%)
প্রধান বিরোধী দল			
জাতীয় পার্টি	২২	৪	২৬ (৭.৪২%)
অন্যান্য বিরোধী দল			
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৬	১	৭ (২.০০%)
গণফোরাম	২	০	২ (০.৫৭%)
স্বতন্ত্র সদস্য	৩	১	৪ (১.১৪%)
মোট	**৩০০**	**৫০**	**৩৫০**

সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বা তদূর্ধ্ব প্রায় ৭৭ শতাংশ; এইচএসসি সমমানের প্রায় ১২ শতাংশ; এসএসসি ও তার কম ১১ শতাংশ সদস্য। সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ী ৬১ শতাংশ, আইনজীবী ১৩ শতাংশ, রাজনীতিক ৫ শতাংশ, অন্যান্য ২১ শতাংশ (শিক্ষক, চিকিৎসক, কৃষক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তা, গৃহিণী, পরামর্শক ইত্যাদি)। উল্লেখ্য, প্রথম সংসদে ১৮ শতাংশ সদস্যের পেশা ছিল ব্যবসা, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে একাদশ সংসদে এসে দাঁড়িয়েছে ৬১ শতাংশে। অন্যদিকে ভারতের ১৭তম

লোকসভায়[৭] সংসদ সদস্যদের মধ্যে রাজনীতিক ৩৯ শতাংশ, ব্যবসায়ী ২৩ শতাংশ, আইনজীবী ৪ শতাংশ এবং অন্যান্য পেশার সদস্য রয়েছেন ৩৪ শতাংশ।

সরাসরি নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে পুরুষ ৯২ ও নারী ৮ শতাংশ এবং সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে ৭৯ ও ২১ শতাংশ। নির্বাচিত সদস্যদের একাংশ তাদের হলফনামায় সঠিক তথ্য (আয়ের উৎস, সম্পদের পরিমাণ, নির্বাচনী ব্যয় ও ব্যয়ের উৎস ইত্যাদি) প্রদান করেননি। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ২১ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ছিল।[৮]

চিত্র ১ : সংসদ সদস্যদের মূল পেশার তুলনামূলক চিত্র (শতকরা হার)

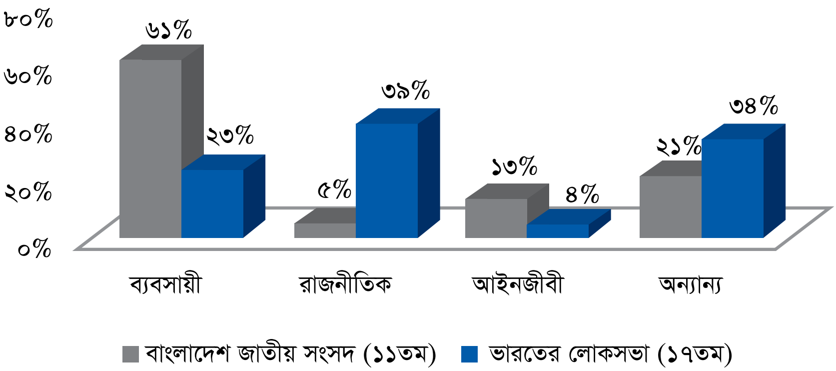

একাদশ সংসদে কার্যদিবস ও কার্যসময়ের ব্যবহার

একাদশ সংসদের পাঁচটি অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ৬১, ব্যয়িত মোট সময় ২৩৪ ঘণ্টা এবং বৈঠককাল প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। সংসদ অধিবেশনে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয়েছে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কার্যক্রমে (৩১ শতাংশ), যেখানে আইন প্রণয়নে (বাজেট ব্যতীত) ৯ শতাংশ সময় ব্যয় করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা পর্বে সদস্যদের বক্তব্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং যুক্তিসংগত বিতর্কের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অধিকাংশ সদস্য আলোচ্য বিষয়ের বাইরে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন, কোনো কোনো সদস্য নিজ নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নসংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি উত্থাপনে বরাদ্দ সময়ের প্রায় পুরোটাই ব্যয় করেছেন। সরকারদলীয় সদস্যদের বক্তব্যে নিজ সরকারের আমলের বিভিন্ন কাজের ও পদক্ষেপের প্রশংসা প্রাধান্য পেলেও সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম-দুর্নীতির মতো বিষয় তুলনামূলকভাবে কম প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে বিরোধীদলীয় সদস্যদের বক্তব্যে সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যা, যেমন ব্যাংক খাতে অনিয়ম-

দুর্নীতি, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি সত্ত্বেও দুর্নীতি হ্রাসে পদক্ষেপের ঘাটতি, আয়বৈষম্য বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের তদন্তভিত্তিক সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপের ঘাটতি, 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮'-এর বিতর্কিত ধারা বাতিলের মতো বিষয় উঠে এসেছে।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

একাদশ সংসদের পাঁচটি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট সময়ের ৯ শতাংশ **ব্যয়িত** হয়। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ভারতের ১৭তম লোকসভায়[৯] এই হার ছিল ৪৫ শতাংশ। পাঁচটি অধিবেশনে ১৬টি সরকারি বিল (বাজেট বিল ব্যতীত) পাস হয়। এর মধ্যে সংশোধনীমূলক আইন ছিল ছয়টি। পাসকৃত আইনের মধ্যে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন, আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন সংশোধন, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধন উল্লেখযোগ্য। বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর সদস্যদের আলোচনা, মন্ত্রীর বক্তব্যসহ একটি বিল পাস করতে গড়ে প্রায় ৩২ মিনিট সময় ব্যয় হয়, যেখানে ২০১৯ সালে ভারতের ১৭তম লোকসভায় প্রতিটি বিল পাসে গড়ে প্রায় ১৮৬ মিনিট[১০] ব্যয় হয়।

অধিকাংশ সংসদীয় কমিটিতে বিলের ওপর আলোচনায় ঘাটতি লক্ষ করা যায়। বিলের ওপর সংশোধনী এবং যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে প্রধান বিরোধী দল ও অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়েছে। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দল ৬৭ শতাংশ, অন্যান্য বিরোধী সদস্য ১৭ শতাংশ, সরকারি দল ১৬ শতাংশ (বিল উত্থাপনকারী মন্ত্রীরা) সময় ব্যয় করেছে।

অন্যদিকে ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৪ জন সদস্য (৪ শতাংশ) বিলের ওপর নোটিশ দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, যাদের মধ্যে আটজন সদস্য বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। বাকি সদস্যদের ভূমিকা 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোট দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাসকৃত বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর মধ্যে বাক্যপুনর্গঠন, ধারা ও উপধারার পুনর্বিন্যাস এবং সমার্থক শব্দাবলি ও বিরামচিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন প্রাধান্য পেয়েছে। বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে অধিকাংশই কণ্ঠভোটে নাকচ হতে দেখা যায়। এ ছাড়া আইন প্রণয়নে জনগণের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদের একাংশের দক্ষতার ঘাটতি এবং অধিকাংশ সদস্যের পূর্বপ্রস্তুতির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিল পাসের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে সরকারি দল একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে।

চিত্র ২ : আইন প্রণয়ন-প্রক্রিয়ায় সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণে ব্যয়িত সময় (শতকরা হার)

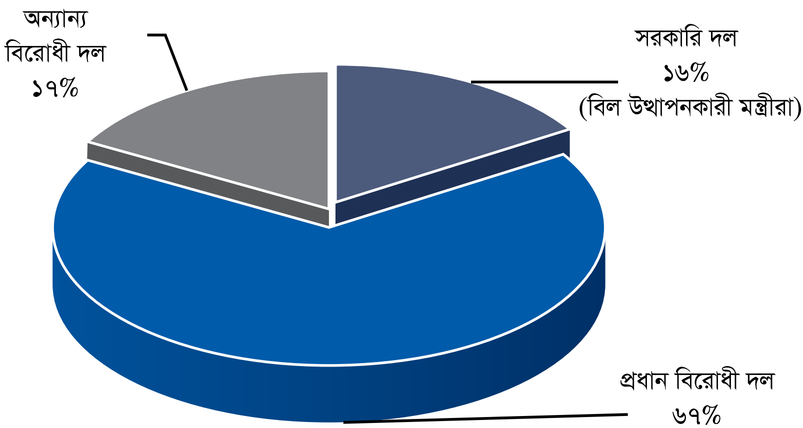

বাজেট আলোচনা

সরকারি ও বিরোধী উভয় দলীয় সদস্যের বক্তব্যেই খেলাপি ঋণ, ব্যাংক খাতে সরকারের অব্যাহত ভর্তুকি ও সঞ্চয়পত্রের সুদের হার হ্রাস, অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হলেও তা সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকদের কাছে প্রাধান্য পায়নি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৫৯টি মঞ্জুরি দাবির ওপর বিরোধীদলীয় সদস্যরা ৪৮৪টি ছাঁটাই প্রস্তাব দিলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় খাতে মাত্র চারটি ছাঁটাই প্রস্তাবের ওপর তারা আলোচনার সুযোগ পান। পরবর্তী কালে সব ছাঁটাই প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। এই নাকচ হওয়ার ক্ষেত্রেও সংসদে সরকারি দলের একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। ‘অর্থবিল-২০১৯’ এর ওপর বিরোধীদলীয় সদস্যদের জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবও কণ্ঠভোটে নাকচ হয়। অন্যদিকে সরকারদলীয়[১১] ও প্রধান বিরোধীদলীয়[১২] সদস্যদের একাংশ প্রস্তাবিত বাজেটে কালোটাকা সাদা করার প্রস্তাব সমর্থন করেছেন, যদিও তা অনৈতিক, বৈষম্যমূলক ও সংবিধানপরিপন্থী। বাজেটের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সুনির্দিষ্ট সংশোধনীর প্রস্তাব থাকলেও উল্লেখযোগ্য কোনো সংশোধনী ছাড়াই ‘অর্থবিল-২০১৯’ সংসদে পাস হয়। এ ছাড়া বাজেট আলোচনায় সদস্যদের একাংশ বাজেটের বাইরে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে বক্তব্য[১৩] প্রদান করেছেন।

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম

বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনা

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব : এই পর্বে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও প্রকল্প সম্পর্কিত প্রশ্ন বেশি উত্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে পদ্মা সেতু ও বরিশাল রেললাইনের অগ্রগতি, ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপনের পরিকল্পনা, ঢাকার যানজট নিরসনে গৃহীত পরিকল্পনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের পরিবর্তে সম্পূরক প্রশ্নে সদস্যদের আগ্রহ বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে–কোনো কোনো ক্ষেত্রে সদস্যদের একাংশ সম্পূরক প্রশ্ন করতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সদস্যদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব : মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি ১২টি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এ পর্বে সদস্যদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর পর্বে একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রশ্নকর্তা সদস্যদের একাংশের অনুপস্থিতির কারণে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। নির্ধারিত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বিকল্প উত্তরদাতা যথাযথ উত্তর প্রদান করতে না পারায় সদস্যরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিশ : কার্যপ্রণালি বিধি (৭১) অনুযায়ী জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য ৭৩৭টি নোটিশ জমা পড়লেও আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছে ৫১টি (৭ শতাংশ) নোটিশ। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট নোটিশের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি (৫৩টি)। দেশের সমসাময়িক জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনার সুযোগ না পাওয়ায় সদস্যদের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

অনির্ধারিত আলোচনা : অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়ের মধ্যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিকরণ, খাদ্যে ভেজাল রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ছিল। এই পর্বে অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা সমসাময়িক বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার দাবি করলেও তা প্রাধান্য পায়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সদস্যদের একাংশ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ও উত্থাপন করেছেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব : এই পর্বে ২৫টি নোটিশ আলোচনার জন্য জমা পড়ে এবং এর মধ্যে ১৫টি নোটিশের ওপর সংশ্লিষ্ট সদস্যরা আলোচনার সুযোগ পান। আলোচিত প্রস্তাবের সবগুলোই প্রত্যাহৃত হয়। একজন সরকারদলীয় সদস্য তামাকজাত দ্রব্যের ওপর প্রচলিত স্তরভিত্তিক মূল্যের পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করারোপ করার দাবি জানিয়ে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা নজিরবিহীনভাবে দুইবার ভোট গ্রহণের মাধ্যমে বাতিল হয়।

অন্যান্য আলোচনা : জনগুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক বিষয়ে সাধারণ আলোচনার জন্য নোটিশ বা প্রস্তাব উত্থাপন করার সুযোগ থাকলেও এ বিষয়ে সদস্যদের আগ্রহের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো চুক্তি ছাড়া সম্পাদিত সব আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকলেও এই পাঁচটি অধিবেশনে এ ধরনের কোনো চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়নি।

সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি

একাদশ সংসদের প্রথম পাঁচটি অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি প্রতি কার্যদিবসে ২৩৩ জন (মোট সদস্যের ৬৭ শতাংশ)। পুরুষ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ২২ শতাংশ, যেখানে নারী সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ৮৫ শতাংশ। অন্যদিকে সংসদ নেতা সংসদ অধিবেশনের ৯২ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন এবং বিরোধীদলীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন ৪৮ শতাংশ কার্যদিবসে।

ওয়াকআউট, সংসদ বর্জন ও কোরামসংকট : একাদশ সংসদের প্রথম পাঁচটি অধিবেশনে প্রধান বিরোধীদলীয় বা অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা সংসদ বর্জন ও ওয়াকআউট করেননি। প্রতি কার্যদিবসে কোরামসংকট ছিল গড়ে ১৯ মিনিট এবং পাঁচটি অধিবেশনের প্রকৃত মোট সময়ের ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ সময় কোরামসংকট ছিল। এই সময়ে মোট কোরামসংকট ছিল ১৯ ঘণ্টা ২৬ মিনিট, যার প্রাক্কলিত অর্থমূল্য[১৪] প্রায় ২২ কোটি ৮ লাখ ৬৩ হাজার ৬২৭ টাকা।

সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম

একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনে সব সংসদীয় কমিটি (৫০টি) গঠন করা হয়। কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি সভা করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অধিকাংশ কমিটি তা পালন করেনি– ৪৭টি কমিটির মোট ২৮৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি মাসে ন্যূনতম একটি করে সভা করেছে সরকারি হিসাব ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি। সর্বোচ্চ ২০টি সভা করেছে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি এবং কেবল একটি সভা করেছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি। পিটিশন কমিটি, কার্যপ্রণালি-বিধি ও বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি কোনো সভা করেনি। অনেক কমিটিতে সদস্যদের (সভাপতিসহ) কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা বিদ্যমান, যা স্বার্থের দ্বন্দ্বের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। এমন ২৪টি কমিটির মধ্যে সরকারি হিসাব, অর্থ, নৌপরিবহন, বাণিজ্য, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া গত সরকারের ১৫ জন মন্ত্রীকে সংসদীয় কমিটির সভাপতি[১৫] করার ফলে স্বার্থের সংঘাতের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে; বিশেষ করে গত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বে যেসব মন্ত্রী ছিলেন, তাদেরই সেসব মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা হয়েছে। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, স্বরাষ্ট্র, শ্রম ও কর্মসংস্থান, শিল্প, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি উল্লেখযোগ্য।

কোনো কোনো সংসদীয় কমিটির সদস্যদের একাংশের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অনিয়ম ও বিধিবহির্ভূত সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ ছিল। একটি সংসদীয় কমিটি সদস্যদের অনুকূলে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করেছে। পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বিশেষ বরাদ্দ প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে দেখা যায়। একটি কমিটির একজন সদস্যের নিজ ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয় কমিটির আলোচনায় উত্থাপন করতে দেখা যায়। এ ছাড়া অন্য কমিটির একজন সদস্যের নামে বরাদ্দকৃত জমি বেদখল এবং তার ছেলের একটি সরকারি আবাসন প্রকল্পে প্লট বুঝিয়ে না দিয়ে টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয় তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট কমিটি

সুপারিশ করেছে। অন্যদিকে একাধিক সংসদীয় কমিটি বিদেশে শিক্ষাসফর আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছে এবং প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সংশোধন করে এ-সংক্রান্ত প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছে কোনো কোনো কমিটি।[১৬] অন্যদিকে পিটিশন কমিটির মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের সরাসরি অভিযোগ করার সুযোগ থাকলেও প্রচারণার ঘাটতির কারণে এটি কার্যকর নয়। সর্বোপরি সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করার সুযোগ থাকলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না। অন্যদিকে ২০১৯ সালে স্কটল্যান্ড সংসদের[১৭] এবং ভারতের লোকসভার[১৮] সংসদীয় পিটিশন কমিটি কর্তৃক যথাক্রমে ৩৬ ও ৫টি পিটিশনকৃত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমলে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা

নির্বাচনকালে মহাজোটের একটি দল প্রধান বিরোধী দল হওয়ায় সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় তাদের জোরালো ভূমিকার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষত, প্রধান বিরোধী দল সতর্কতার সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছে। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা তুলনামূলক বেশি সক্রিয় থাকলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ের ছিল না। প্রধান বিরোধী দলের ২৬ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন বিলের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধীদলীয় সদস্যরা সরকারদলীয় সদস্যদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের কঠোর সমালোচনা করেছেন ও তাদের বক্তব্য প্রদানে বাধার সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর সমালোচনামূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন।

সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

সংসদ সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা : সংসদ অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের যথাযথ আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, সংসদে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক শব্দের ব্যবহার অব্যাহত ছিল। অধিবেশন চলাকালে সদস্যদের বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা, কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালে তার নিকটবর্তী আসনের সদস্যদের নিজ আসনে বসে নিজেদের মধ্যে কথোপকথন এবং সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের অমনোযোগিতা লক্ষ করা গেছে। সদস্যদের একাংশের অমনোযোগিতার কারণে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ওপর দুইবার ভোট গ্রহণ করতে দেখা গেছে। এ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবকারী সংসদ সদস্য বলেন, সংসদে একটি প্রস্তাব দুইবার ভোটের নজির আছে কি না, তা জানা নেই। সরকারের হুইপ হাত ওঠাবেন আর পরবর্তী সময়ে সেই হাত দেখে আবার তাদের ভোট পাল্টাবেন– এই নজির সংসদে থাকা উচিত নয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষা (কটূক্তি) ব্যবহার বন্ধে স্পিকার নীরব ছিলেন। এসব সদস্যকে তাদের সতর্ক করা বা শব্দ এক্সপাঞ্জ করার ক্ষেত্রে তার কার্যকর ভূমিকা

পালনে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া অধিবেশন চলাকালে গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি ছিল। সংরক্ষিত নারী আসনের একজন সরকারদলীয় সদস্যের পাবলিক পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বন এবং একজন অন্যান্য বিরোধী সদস্য শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানি করে তা নিয়মবহির্ভূতভাবে বিক্রি[১৯] করলেও, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে দুর্নীতি ও অন্যান্য অসদাচরণের অভিযোগে ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে সরকারি ও বিরোধী দলের ১১ জন সংসদ সদস্যকে[২০] বহিষ্কার করা হয়।

সংসদীয় উন্মুক্ততার চর্চা : সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রচলিত পদ্ধতি, বিশেষত জনমত যাচাই-বাছাই এবং সংসদীয় কমিটি কর্তৃক জনমত গ্রহণের চর্চা লক্ষ করা যায়নি। সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যবিবরণীসহ কমিটির প্রতিবেদন সহজলভ্য ছিল না, বিশেষ করে সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদনগুলো সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়নি। সংসদে সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদীয় কার্যক্রমের বিবরণী, সংসদ সদস্যদের সম্পদের হালনাগাদ তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার কোনো উদ্যোগ ছিল না। এ ছাড়া সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

সংসদীয় কার্যক্রমে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি অধিবেশনে ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে ৪৬ শতাংশ নারী সংসদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন, যেখানে পুরুষ সদস্যদের উপস্থিতি ছিল ৪২ শতাংশ। সার্বিকভাবে নারী সদস্যদের উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও দেখা যায় আলোচনা পর্বের অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, জনগুরুত্বসম্পন্ন গৃহীত নোটিশ ইত্যাদি পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ পুরুষ সদস্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩ : সংসদীয় কার্যক্রমে নারী ও পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণের তুলনামূলক চিত্র (সদস্যের শতকরা হার)

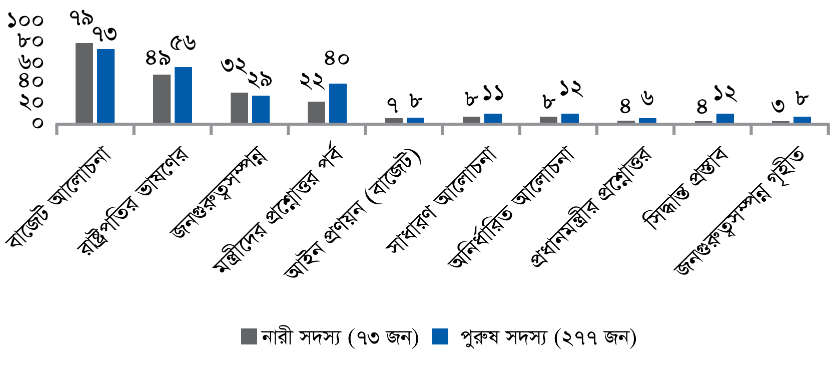

সর্বোচ্চ সাতটি পর্বে অংশগ্রহণ করেছেন সরকারি দলের একজন নির্বাচিত নারী সদস্য এবং সর্বনিম্ন একটি পর্বে অংশগ্রহণ করেছেন ১৪ জন, যাদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন সংরক্ষিত আসনের সদস্য। স্পিকার, সংসদ নেতা ও বিরোধী দলের নেতা ব্যতীত তিনটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নারী সদস্যরা।

আইন প্রণয়ন, বাজেট আলোচনা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ইত্যাদি পর্বে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্যদের তুলনায় বেশি অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে সাধারণ আলোচনা, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর, অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্যরা বেশি অংশগ্রহণ করেছেন। উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হলেও সংসদীয় আলোচনায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। তবে সংসদের কোনো না কোনো কার্যক্রমে সব নারী সদস্য অংশ নিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, অনির্ধারিত আলোচনা, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সাধারণ আলোচনা ও সংসদের সমাপনী বক্তব্য পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন ও আলোচনা হয়। বিভিন্ন পর্বে আলোচিত বিষয় ছিল নারী কল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয়ভাবে গৃহীত পদক্ষেপ, নির্যাতন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি ও প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়ন ইত্যাদি (চিত্র ৪)।

গবেষণায়প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায়, সংসদে নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা এখনো অনুল্লেখ্য।

চিত্র ৪ : নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয় (শতকরা হার)

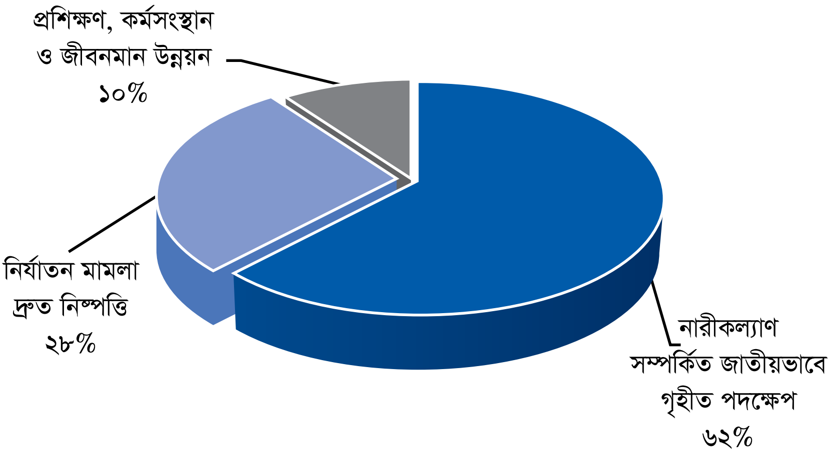

সংসদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনা

একাদশ সংসদের প্রথম পাঁচটি অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। একজন মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংরক্ষিত আসনের সরকারদলীয় একজন নারী সদস্য সুনির্দিষ্টভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তবে এই পাঁচটি অধিবেশনের বিভিন্ন পর্বে সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছেন, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসডিজির বিভিন্ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্যনিরাপত্তা, নিরাপদ পানি, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্য, শিক্ষার গুণগত মান, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, ন্যায়বিচার, টেকসই নগর, কর্মসংস্থান, নিরাপদ অভিবাসন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে এসডিজির যেসব গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত আলোচনা সদস্যদের বক্তব্যে উঠে আসেনি, তার মধ্যে সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান, সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই জ্বালানি ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা এবং অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন প্রবর্ধন ও উদ্ভাবন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসডিজি বাস্তবায়নে সংসদে আলোচনার ক্ষেত্র এখনো সন্তোষজনক নয় এবং এ বিষয়ে সংসদ সদস্যদের আগ্রহের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

নির্ধারিত নির্দেশকে অষ্টম থেকে একাদশ সংসদের চিত্র (প্রথম থেকে পঞ্চম অধিবেশন)

দশম ও একাদশ সংসদের গঠন, বৈশিষ্ট্য এবং কথিত ও নিয়মরক্ষার প্রধান বিরোধী দলের যথাযথ ভূমিকার ঘাটতি বিবেচনায় এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চার গুণগত দিক পর্যালোচনা সাপেক্ষে এ দুটি সংসদের সঙ্গে অষ্টম ও নবম সংসদের পরিসংখ্যানগত তথ্য তুলনাযোগ্য নয়। নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ সংসদের প্রথম থেকে পঞ্চম অধিবেশনের চিত্র নিচে উপস্থাপন করা হলো :

সারণি ৩ : নির্ধারিত নির্দেশকে অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ সংসদের চিত্র (প্রথম-পঞ্চম অধিবেশন)

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (প্রথম-পঞ্চম অধি:)	নবম সংসদ (প্রথম-পঞ্চম অধি:)	দশম সংসদ (প্রথম-পঞ্চম অধি:)	একাদশ সংসদ (প্রথম-পঞ্চম অধি:)
আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়	৯%	৮%	৬%	৯%
প্রতিটি বিল পাসের গড় সময়	৩৫ মিনিট	২৩ মিনিট	৩১ মিনিট	৩২ মিনিট

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (প্রথম-পঞ্চম অধি:)	নবম সংসদ (প্রথম-পঞ্চম অধি:)	দশম সংসদ (প্রথম-পঞ্চম অধি:)	একাদশ সংসদ (প্রথম-পঞ্চম অধি:)
সংসদীয় কমিটি	• প্রথম অধিবেশনে ৫টি কমিটি গঠন • বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়	• প্রথম অধিবেশনে সব কমিটি গঠন • দুটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের, একটি কমিটির সভাপতি অন্যান্য বিরোধী সদস্য	• প্রথম অধিবেশনে সব কমিটি গঠন • একটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের	• প্রথম অধিবেশনে সব কমিটি গঠন • তিনটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
সংসদীয় কমিটির বৈঠক	কমিটি গঠনের এক বছরের মধ্যে কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি	৯টি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান	চারটি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান	দুটি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান
সদস্যদের গড় উপস্থিতি (কার্যদিবস)	২৫%	৬৮%	৬৮%	৬৭%
সংসদ নেতার উপস্থিতি (কার্যদিবস)	৫২%	৭২%	৮৩%	৯২%
বিরোধী নেতার উপস্থিতি (কার্যদিবস)	১২%	৩%	৫৭%	৪৮%

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (প্রথম-পঞ্চম অধি:)	নবম সংসদ (প্রথম-পঞ্চম অধি:)	দশম সংসদ (প্রথম-পঞ্চম অধি:)	একাদশ সংসদ (প্রথম-পঞ্চম অধি:)
বিরোধী দল/ জোটের ওয়াকআউট	১১ বার	২১ বার	৬ বার	ওয়াকআউট করেনি
প্রধান বিরোধী দল/ জোটের সংসদ বর্জন	৬১% কার্যদিবস	৭৪% কার্যদিবস	বর্জন করেনি	বর্জন করেনি
৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সদস্যদের উপস্থিতি				
সরকারি দলের সদস্য	১০%	৫১%	৪০%	৪৫%
প্রধান বিরোধী দলের সদস্য	০%	০%	৪০%	২৭%
অন্যান্য বিরোধী সদস্য	৩৮%	০%	৬৩%	৮%

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

প্রশ্নবিদ্ধ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ফলে সংসদীয় কার্যক্রমে, বিশেষত আইন প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা আরও জোরদার হয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচনকালীন মহাজোটের একটি দল নিয়মরক্ষার প্রধান বিরোধী দল হওয়ায় সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় তাদের জোরালো ভূমিকার ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। সংসদীয় কার্যক্রমে আইন প্রণয়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও আইন প্রণয়নের আলোচনায় সংসদ সদস্যদের কম অংশগ্রহণ, অনাগ্রহ ও দক্ষতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অধিকাংশ সংসদীয় কমিটির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যকর জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। সংসদীয় উন্মুক্ততার চর্চায় ঘাটতি রয়েছে, বিশেষ করে আইন প্রণয়নসহ অন্যান্য সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের উদ্যোগ দেখা যায়নি। সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রমাণসহ অভিযোগ থাকলেও সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্পিকারের জোরালো ভূমিকার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংসদে আলোচনার ক্ষেত্র এখনো সন্তোষজনক

নয়। সার্বিকভাবে, একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম পাঁচটি অধিবেশন আইন প্রণয়ন, জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না।

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবির সুপারিশ

সংসদকে কার্যকর করা

১. সংসদকে কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ প্রয়োজন:

- জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাস্তবিক অর্থে অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে হবে।
- সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে সদস্যদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে।
- 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সংসদ সদস্যদের সংসদের ভেতরে ও বাইরের আচরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসারে নির্দেশনা থাকবে।
- সংসদীয় কার্যক্রম এমন হবে যেখানে সরকারি দলের একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তে কার্যকর বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত হবে।

সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি

২. সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারকে বিধি অনুযায়ী রুলিং প্রদান ও অসংসদীয় ভাষা এক্সপাঞ্জ করার ক্ষেত্রে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।

৪. এসডিজির বাস্তবায়নসহ আন্তর্জাতিক সব চুক্তি আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির বিস্তারিত সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৫. আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত বিল সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকেও কার্যকর করতে হবে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি

৬. কোনো কমিটিতে কোনো সদস্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেলে ওই কমিটি থেকে তার সদস্যপদ বাতিল করতে হবে।

৭. বিধি অনুযায়ী কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

৮. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটিসহ জাতীয় বাজেটে তুলনামূলকভাবে বেশি আর্থিক বরাদ্দপ্রাপ্ত শীর্ষ ১০টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিগুলোর মধ্যে অর্ধেক কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধীদলীয় সদস্যদের মনোনয়ন দিতে হবে।

৯. কমিটির সভার প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখিতভাবে কমিটির পরবর্তী সভায় (বিধি অনুযায়ী এক মাসের মধ্যে) জানানোর বিধান করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ

১০. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, বিধি অনুযায়ী কমিটি প্রতি মাসে একটি সভা করতে ব্যর্থ হলে তার ব্যাখ্যাসহ প্রতিবেদন এবং কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১১. সংসদের ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বার্ষিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

১২. সংসদ সদস্যদের সম্পদের প্রতিবছরের হালনাগাদ তথ্যসহ সংসদের বাইরে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ২০১১।

[২] সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট , লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ*, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, ২০১৭।

[৩] মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*, অক্টোবর ২০১২।

[৪] বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ ১৯৭২।

[৫] বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ ১৯৭৩।

[৬] https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS (২২ আগস্ট ২০২০)

[৭] https://www.prsindia.org (১৫ মার্চ ২০২০)

[৮] দৈনিক প্রথম আলো, 'সংসদ সদস্যদের ১৮২ জন ব্যবসায়ী', ৬ জানুয়ারি ২০১৯।

[৯] https://www.prsindia (১৫ মার্চ ২০২০)।

[১০] https://www.prsindia.org (১৮ মার্চ ২০২০)।

[১১] সাপ্তাহিক স্বদেশ খবর, 'আতঙ্ক কাটিয়ে কালোটাকা সাদা করা যাবে তো!' ২৬ জুন ২০১৯।

[১২] বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, 'টাকা সাদা করার সুযোগ দিতে হবে : রওশন', ২৯ জুন ২০১৯।

[১৩] দৈনিক সমকাল, 'বাজেট আলোচনা : মন্ত্রীদের বাড়তি কথা না বলার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর', ১৮ জুন ২০১৯।

[১৪] সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটির ব্যয় প্রাক্কলন করার জন্য দশম সংসদ চলাকালে অর্থবছরগুলোতে জাতীয় সংসদের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সঙ্গে বার্ষিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বার্ষিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

[১৫] দৈনিক মানবজমিন, 'যে কারণে জোরালো নয় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা', ১ জুন ২০১৯।

[১৬] দৈনিক প্রথম আলো, ' নিয়ম মানছে না বেশির ভাগ সংসদীয় কমিটি', ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

[১৭] https://www.parliament.scot/gettinginvolved/petitions/ViewPetitions.aspx (২৯ আগস্ট ২০২০)

[১৮] http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=22&tab=2(29 AvM÷ 2020)

[১৯] দৈনিক প্রথম আলো, 'সাংসদ বুবলী ও হারুন : কেউ কারও চেয়ে কম না', ২৪ অক্টোবর ২০১৯।

[২০] https://www.outlookindia.com/newswire/story/11-tainted-mps-expelled-from-parliament/343915 (২৭ আগস্ট ২০২০)

দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ
বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর একটি ফলোআপ গবেষণা*

শাহজাদা এম আকরাম ও শাম্মী লায়লা ইসলাম

গবেষণার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের দুর্নীতিবিরোধী আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বেশ শক্তিশালী।[১] বাংলাদেশ ২০০৭ সালে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের সদস্য হয় এবং এরপর থেকে এই কনভেনশনের বিভিন্ন অঙ্গীকার নতুন আইন প্রণয়ন বা পুরোনো আইন সংশোধনের মাধ্যমে পূরণ করে আসছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, নির্বাচন কমিশন, তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির বিরুদ্ধে হয় সরাসরি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে অথবা পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে যে রাষ্ট্র এমন পরিস্থিতি তৈরি করবে যেখানে কোনো ব্যক্তি ‘অনুপার্জিত’ আয় ভোগ করতে পারবে না।[২] বাংলাদেশ সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধকে গুরুত্ব দিয়ে পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা- রূপকল্প ২০২১,[৩] সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা[৪] এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন ও বাস্তবায়নে কাজ করছে। এ ছাড়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা দরকার এবং দুর্নীতি দমনবিরোধী কৌশল ছাড়া রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা ও এর অন্তর্ভুক্ত পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে।

তবে শক্তিশালী আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সত্ত্বেও বাংলাদেশে দুর্নীতি গভীরভাবে বিস্তার লাভ করেছে, যার প্রমাণ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমীক্ষা ও সূচকে প্রতিফলিত হয়। টিআইবির নিয়মিত বিরতিতে সম্পন্ন জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায়, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার অনেক বেশি। ২০১৭ সালের খানা জরিপে দেখা যায়, জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০১৫ সালের জরিপের প্রায় কাছাকাছি (৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ)। জাতীয়ভাবে সেবা খাতে দুর্নীতির জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয় ১০,৬৮৮.৯ কোটি টাকা, যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ৩ দশমিক ৪ শতাংশ, একই সময়ের জিডিপির শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ, এবং ২০১৫ সালে জরিপে প্রাপ্ত দুর্নীতির প্রাক্কলনের ২১ দশমিক ২ শতাংশ বেশি।[৫] একই নির্দেশকের

---

* ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

ভিত্তিতে ২০১২, ২০১৫ ও ২০১৭ সালের জরিপগুলো থেকে দেখা যায়, প্রায় সব খাতেই দুর্নীতির পর্যায় একই রকম রয়েছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জরিপ ও সূচকেও বাংলাদেশের দুর্নীতির বিস্তার নিয়ে একই ধরনের ধারণা পাওয়া যায়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৮ সালে বাংলাদেশের স্কোর ১০০-এর মধ্যে ছিল ২৬ (শূন্য থেকে খুবই দুর্নীতিগ্রস্ত থেকে শুরু করে ১০০ পর্যন্ত সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত ধরে)। এই স্কোর অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৯তম।[৬] উল্লেখ্য, এই সূচক প্রবর্তনের শুরু থেকে বাংলাদেশের স্কোর সব সময় ৩০-এর নিচে ছিল, যার অর্থ বাংলাদেশ একটি দুর্নীতিপ্রবণ দেশ।[৭] এ ছাড়া অন্য দুটি সূচক, বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ (কন্ট্রোল অব করাপশন) ও ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নিয়মবহির্ভূত অর্থায়ন ও ঘুষ পর্যালোচনা (অ্যাসেসমেন্ট অব ইরেগুলার পেমেন্টস অ্যান্ড ব্রাইবস), একই ধরনের চিত্র উপস্থাপন করে।[৮] বিশ্ব সক্ষমতা র‍্যাংকিং (গ্লোবাল কমপিটিটিভনেস র‍্যাংকিং) অনুযায়ী 'দুর্নীতির ঘটনা' নির্দেশকে বাংলাদেশের স্কোর ২৮ এবং অবস্থান ১৪৯টি দেশের মধ্যে ১২০তম।[৯]

দুর্নীতির সংস্কৃতি বাংলাদেশের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রশাসনিক সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত, যার একটি রূপ হচ্ছে অর্থ, উপহার ও সুযোগ-সুবিধার বিনিময়।[১০] এ ছাড়া বাংলাদেশের শ্রেণিবিভক্ত ও স্বজনভিত্তিক সামাজিক কাঠামো 'তদবির' সংস্কৃতিতে অবদান রেখেছে। তদবির এমন একটি প্রক্রিয়া যা নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, বিধি, নীতি ও চর্চা ভঙ্গ করার মাধ্যমে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। তদবির বাংলাদেশের প্রশাসনে ব্যাপক প্রচলিত; কারণ সরকারি কর্মচারীরা এর মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী।[১১] একই কারণে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছেও তদবির একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বিদ্যমান নিয়মনীতি এড়িয়ে ব্যক্তিগতভাবে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।[১২]

জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন (ইউএনসিএসি) দুর্নীতিবিরোধী নীতি ও নীতিমালা বাস্তবায়ন, প্রয়োগ ও প্রচারের জন্য জাতীয় আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। যেকোনো দেশের সুশাসনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমনকে কেন্দ্র করে একটি কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২ সালে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দুর্নীতি দমন সংস্থার প্রধান, কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে 'জাকার্তা নীতিমালা' গ্রহণ করা হয়, যেখানে একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়, যার অধীনে দুর্নীতি দমন সংস্থাগুলোকে জবাবদিহির আওতায় আনা যাবে।[১৩] তবে বাস্তবিক অর্থে এই মানদণ্ডের আলোকে বিভিন্ন দেশের সরকারের তাদের নিজস্ব তদারকি ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য কতটুকু রাজনৈতিক সদিচ্ছা আছে তা প্রশ্নবিদ্ধ। এ ছাড়া দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম যাচাই করার কোনো সুসংগঠিত পদ্ধতি ছিল না।

এই ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল উদ্যোগ নেয়। এর মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতার মূল্যায়নসহ দীর্ঘমেয়াদি সংশ্লিষ্টতা, সংলাপ ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে টিআইবি ২০১৬ সালে বাংলাদেশ

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ওপর একটি মূল্যায়ন সম্পন্ন করে। এই গবেষণার ফলাফল ২০১৬ সালের মার্চে একটি মতবিনিময় সভার মাধ্যমে দুদকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে উপস্থাপন ও আলোচনা করা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

২০১৫-১৬ সালে পরিচালিত প্রথম মূল্যায়নের পর দুদকের পরিবর্তনের ধারা পর্যালোচনার জন্য এই ফলোআপ মূল্যায়নটি ২০১৯ সালে পরিচালিত হয়েছে। এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- দুদকের কার্যক্রম ও উন্নতির ক্ষেত্র পর্যালোচনা করা;
- দুদকের কার্যকারিতার পেছনে ক্রিয়াশীল সহায়ক ও বাধাদানকারী প্রভাবক সম্পর্কে পর্যালোচনা করা;
- দুদকের মূল চ্যালেঞ্জগুলোর বাস্তব সমাধান বা সংস্কারের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

এই গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত গুণবাচক পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে :

- সংশ্লিষ্ট আইন, গবেষণা ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইটের তথ্য পর্যালোচনা;
- দুদকের সাবেক চেয়ারম্যান, দুদকের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা, আইনজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও দুদকসংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমকর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ;
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞের দ্বারা প্রাথমিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা; এবং
- ২০২০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি গবেষণার ফলাফল নিয়ে দুদকের চেয়ার, কমিশনার ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত।

এই গবেষণায় দুদকের ভাবমূর্তি ও কর্মদক্ষতাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলো চিহ্নিত করার জন্য তথ্য সংগ্রহের মূল্যায়নকাঠামো বা টুল তৈরি করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল। এটি একটি বাস্তবসম্মত ও সার্বিক মানদণ্ডসংবলিত টুল, যা দুদকের শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রণীত। প্রথম দফায় সম্পন্ন গবেষণার ওপর প্রদত্ত মতামতের ওপর ভিত্তি করে এই কাঠামো সংশোধন করা হয়, আগের তুলনায় বেশ কয়েকটি নির্দেশক পরিবর্তন ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুদকের কার্যক্রম মূল্যায়নের এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময় ছিল ২০১৬ থেকে ২০১৮ এই তিন বছর। ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এই মূল্যায়নের ফলাফল ছয়টি মাত্রায় বিভক্ত ৫০টি নির্দেশকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেসব অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিষয়গুলো দুদককে প্রভাবিত করে এবং একই সঙ্গে দুদকের সুনাম ও প্রকৃত কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এমন নির্দেশক এই মূল্যায়নের জন্য বাছাই করা হয়েছে। এসব নির্দেশক দুদকের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা নিরূপণ এবং বিচ্যুতি ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র চিহ্নিত করার মতো করে তৈরি করা হয়েছে (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ১ : গবেষণার ছয়টি ক্ষেত্র

মূল্যায়নের মাত্রা	নির্দেশক সংখ্যা
১. স্বাধীনতা ও মর্যাদা	৯
২. অর্থ ও মানবসম্পদ	৯
৩. জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার	৯
৪. অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের	৯
৫. প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম	৮
৬. সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক	৬
মোট	**৫০**

গবেষণার স্কোরিংয়ের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি নির্দেশকের সম্ভাব্য তিনটি স্কোর– উচ্চ (২), মধ্যম (১) ও নিম্ন (০) দেওয়া যায়, যা তিনটি ভিন্ন রং দিয়ে নির্দেশিত। স্কোর দেওয়ার জন্য কিছু পূর্বনির্ধারিত শর্ত বা মানদণ্ড রয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই স্কোর চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য নির্ধারিত ডেটাবেজে দেওয়া ও বিশ্লেষণ করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রের মোট স্কোর পাওয়ার জন্য ওই ক্ষেত্রের সবগুলো নির্দেশকের স্কোর প্রথমে যোগ করা হয়। এরপর ওই ক্ষেত্রে যতগুলো নির্দেশক রয়েছে তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে এর শতকরা হার বের করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম ক্ষেত্রের (স্বাধীনতা ও মর্যাদা) নির্দেশকগুলোর মোট স্কোর ১২ (চারটি নির্দেশক ২ করে, চারটি নির্দেশক ১ করে এবং একটি নির্দেশক ০ পেয়েছে)। এ ক্ষেত্রের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোর ১৮ (৯টি নির্দেশক x প্রতিটি নির্দেশকের সর্বোচ্চ স্কোর ২ ধরে)। কাজেই প্রথম ক্ষেত্রের চূড়ান্ত স্কোর ১২/১৮ x ১০০ = ৬৭%।

ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার জন্য প্রাপ্ত সার্বিক স্কোরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে–সার্বিক স্কোর ৬৭ থেকে ১০০ ভাগের মধ্যে হলে 'উচ্চ', সার্বিক স্কোর ৩৪ থেকে ৬৬ শতাংশের মধ্যে হলে 'মধ্যম' এবং সার্বিক স্কোর শূন্য থেকে ৩৩ শতাংশের মধ্যে হলে 'নিম্ন'।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

এই গবেষণার মূল্যায়ন অনুযায়ী বাংলাদেশ দুর্নীত দমন কমিশনের সার্বিক স্কোর ৬০ শতাংশ, যা 'মধ্যম' পর্যায়ের নির্দেশ করে। লক্ষণীয় যে এই স্কোর 'উচ্চ'পর্যায়ের থেকে ৭ পয়েন্ট কম এবং নির্দেশ করে উচ্চপর্যায়ে প্রবেশ করতে প্রতিষ্ঠানটির কয়েকটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে উন্নয়ন করা প্রয়োজন। গবেষণার স্কোর অনুযায়ী দুদক ৪২ শতাংশ (২১টি) নির্দেশকের ক্ষেত্রে 'উচ্চ', ৩৬ শতাংশ (১৮টি) ক্ষেত্রে 'মধ্যম' এবং ২২ শতাংশ (১১) নির্দেশকের ক্ষেত্রে 'নিম্ন' স্কোর করেছে। দুদকের 'প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম' শীর্ষক ক্ষেত্র সর্বোচ্চ (৭৫ শতাংশ) স্কোর পেয়েছে, যার পরেই রয়েছে 'স্বাধীনতা ও মর্যাদা' (৬৭ শতাংশ) এবং 'সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক' (৬৭ শতাংশ)। অপরদিকে 'অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের' (৪৪ শতাংশ) বিষয়ক ক্ষেত্রে দুদক সবচেয়ে কম স্কোর পেয়েছে এবং এ বিষয়টিতে দুদকের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

সারণি ২ : পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ : ক্ষেত্র অনুযায়ী নির্দেশক

ক্ষেত্র	নির্দেশক								
স্বাধীনতা ও মর্যাদা	প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা	কমিশনারদের নিয়োগ ও অপসারণ	কাজের আওতা	অধিক্ষেত্র	তদন্ত ও মামলা করার ক্ষমতা	প্রতিবেদন দাখিল ও সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষমতা	আইনি স্বাধীনতা	কর্মসম্পাদনের স্বাধীনতা	দুদকের ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার
অর্থ ও মানবসম্পদ	জাতীয় বাজেটের সাপেক্ষে দুদকের বাজেট (হার)	চাহিদার সাপেক্ষে বাজেটের প্রতুলতা	বাজেটের নিশ্চয়তা ও স্থিতিশীলতা	কর্মীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা	কর্মী বাছাই	তদন্ত ও মামলার দক্ষতা	দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের দক্ষতা	কর্মীদের প্রশিক্ষণ	কর্মীদের স্থিতিশীলতা
জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার	বার্ষিক প্রতিবেদন	তথ্য প্রদানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সাড়া দান	বাহ্যিক পর্যালোচনা কাঠামো	অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা কাঠামো	প্রক্রিয়া অনুসরণ	দুর্নীতির অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশ	দুর্নীতির অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্নীতির অভিযোগের ফলাফল	অভ্যন্তরীণ শুদ্ধাচারকাঠামো
অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের	দুর্নীতির অভিযোগকারীর / তথ্যদাতার অভিগম্যতা	দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	স্বপ্রণোদিত তদন্ত	দক্ষতা ও পেশাদারত্ব	মামলার হার	দণ্ডাদেশের হার	প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত	সম্পদ আটক ও পুনরুদ্ধার	দুদকের কর্মক্ষমতা
প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম	দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দের হার	কৌশলগত পরিকল্পনা	দুর্নীতিবিরোধী শিক্ষা ও উন্নয়ন	প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা	প্রতিরোধমূলক সুপারিশ	দুর্নীতির ঝুঁকির ওপর গবেষণা	দুর্নীতিবিরোধী প্রচার-প্রচারণা	অনলাইন যোগাযোগ	
সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক	সরকারের সহায়তায় আস্থা	অন্যান্য শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা	আন্তর্জাতিক যোগাযোগ	অন্যান্য দেশের সহযোগিতা	দুদকে প্রান্তিক গোষ্ঠীর অভিগম্যতা			

চিত্র ১ : ক্ষেত্রভিত্তিক ও সার্বিক স্কোর

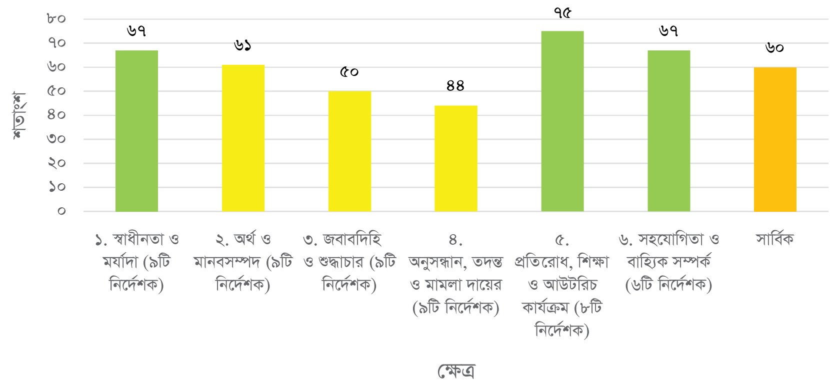

নিচে দুদকের দুর্বল দিকগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে ক্ষেত্র অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হলো।

ক্ষেত্র ১ : স্বাধীনতা ও মর্যাদা

এই ক্ষেত্রের অধীন নয়টি নির্দেশকের মধ্যে চারটির স্কোর ‘উচ্চ’, চারটির স্কোর ‘মধ্যম’ ও একটি ‘নিম্ন’ স্কোর পেয়েছে। আইনে আর্থিক বিষয়ে দুদককে (সরকারের ওপর বাজেটের জন্য সামান্য নির্ভরশীলতাসহ) পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আইনে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হয়েছে। দুদকের মোট **১১**টি কাজের মধ্যে পাঁচটি কাজ প্রতিকারমূলক ও ছয়টি প্রতিরোধমূলক। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে আইনের তফসিলে উল্লিখিত অপরাধগুলোর অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, দুর্নীতিবিরোধী শিক্ষা ও গবেষণা, সরকারি প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক চর্চা মূলধারাকরণে সততাবিষয়ক পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি। দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা পাঁচ বছরের জন্য নিয়োজিত হন এবং আইনে বর্ণিত অপসারণ পদ্ধতি ছাড়া তাদের অপসারণ করা যায় না।

তবে দুদকের কার্যক্রম ও ক্ষমতার ব্যবহারের কারণে এর স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দুদক বিরোধী দলের রাজনীতিকদের হয়রানি করা এবং ক্ষমতাসীন দল বা জোটের রাজনীতিকদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শনে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের সময় দুদকের কার্যক্রমে। আরও ধারণা করা হয়, দুদক রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ নয়, কারণ দুর্নীতির ঘটনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে এটি নিরপেক্ষ আচরণ দেখাতে সমর্থ হয়নি। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ অভিযোগ করেন যে কমিশন পক্ষপাতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সবার বিরুদ্ধে সমানভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। তথ্যদাতাদের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা হচ্ছে যে যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, তাদের বেশির ভাগই বিরোধী রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত, যদিও কয়েকজন ক্ষমতাসীন দলের সদস্য।

সব সরকারি খাতসংশ্লিষ্ট দুর্নীতি দুদকের অধিক্ষেত্র। এ ছাড়া বেসরকারি খাতের ক্ষেত্রে কেবল অর্থ পাচার, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সরকারি কাজে ঘুষ নিয়ে কাজ করে। ২০১৫ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ সংশোধনের মাধ্যমে শুধু ঘুষ ও দুর্নীতিসংক্রান্ত অর্থ পাচারের বিষয়টি দুদকের আওতাভুক্ত–এই যুক্তিতে অর্থ পাচারসংক্রান্ত মৌলিক বিষয় যেমন মুদ্রা পাচার, মিস ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থ পাচারের মতো বিষয় ইত্যাদি দুদকের এখতিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া দুদক বিভিন্ন দুর্নীতিপ্রবণ প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিবেদন তৈরি ও সুপারিশ করলেও এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ক্ষমতা তাদের নেই।

দুদকের কর্মসম্পাদনের স্বাধীনতাও কিছুটা সীমিত। কিছু ক্ষেত্রে দুদক সরকার ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশীজনের চাপের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ ছাড়া সরকারি চাকরি আইন ২০১৮-তে সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক সম্পর্কিত বিধানটির ফলেও দুদকের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে সরকারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়ানোর জন্য দুদক নিজস্ব ধারণাপ্রসূত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করা থেকে বিরত থাকে।

ক্ষেত্র ২ : অর্থ ও মানবসম্পদ

এ ক্ষেত্রে নয়টি নির্দেশকের মধ্যে চারটির স্কোর 'উচ্চ', তিনটির স্কোর 'মধ্যম' ও দুটির স্কোর 'নিম্ন'। দেখা গেছে, ২০১৬ থেকে ২০১৮ এই তিন বছরে দুদকের বাজেটের গড় অনুপাত জাতীয় মোট বাজেটের শূন্য দশমিক ০৩১ শতাংশ, যেখানে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড শূন্য দশমিক ২ শতাংশ। যদিও দেখা যাচ্ছে যে দুদকের প্রকৃত আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু তারপরও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে যাচ্ছে। যেমন প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট না থাকার ফলে কর্মীদের কার্যকারিতা, দক্ষতা ও পেশাদারত্বের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। ২০১৬ থেকে ২০১৮ সালে দুদকের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বাজেটের গড়ে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে (আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ১-৩ শতাংশ)। এ ছাড়া সম্পদের মালিকানার অবৈধ পরিবর্তন, ব্যাংক খাতের দুর্নীতি, সম্পদ আত্মসাৎ ইত্যাদি ধরনের দুর্নীতি মোকাবিলায় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবীদের মধ্যে পর্যাপ্ত মানের ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীরাও পর্যাপ্ত দক্ষ নন এবং বেশির ভাগ সময়ই তারা স্থানীয় কমিটিগুলোর ওপর (দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘ) নির্ভর করেন।

অন্যদিকে যদিও দুদকের কর্মীরা সরকারি বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন ও সুবিধা এবং ১০ম গ্রেড ও এর নিচের পর্যায়ের কর্মীরা রেশন ও ঝুঁকিভাতা পান, মাসিক বেতন এখনো বেসরকারি পর্যায়ের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

ক্ষেত্র ৩ : জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার

এই ক্ষেত্রের অধীনে নয়টি নির্দেশকের মধ্যে তিনটি 'উচ্চ', তিনটি 'মধ্যম' ও তিনটি 'নিম্ন' স্কোর পেয়েছে। দুদকের জবাবদিহি ও সার্বিক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রধান উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে বাহ্যিক কোনো সার্বিক পর্যবেক্ষণব্যবস্থা না থাকা, যেখানে দুদক কেবল রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন

দাখিল করে। যদিও নিয়মিতভাবে তদন্ত প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য দুদকের তদারকি ও মূল্যায়ন শাখা রয়েছে, কিন্তু এই কাঠামোতে জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোনো ব্যবস্থা নেই। দুদকের বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়া হলেও এই প্রতিবেদনের ওপর সংসদে কোনো আলোচনা হয় না। এ ছাড়া দুদকের কর্মীরা আচরণ ও শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধি ২০০৭ ও দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) সার্ভিস বিধি ২০০৮ দ্বারা পরিচালিত হলেও পৃথক কোনো আচরণবিধি নেই। যদিও ২০১৯ সালে একটি খসড়া তৈরি হয়েছে, যা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়নি।

এ ছাড়া দুদকের ইন্টারনাল করাপশন প্রিভেনশন কমিটি দুদকের কোনো কর্মীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করে। তবে এ ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাতের ঝুঁকি থাকে। তবে আইন অনুযায়ী দুদক প্রয়োজন মনে করলে সরকারের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে তদন্ত করার অনুরোধ করতে পারে। অপরদিকে দুদকের বিরুদ্ধে একই ধরনের মামলা সমভাবে না চালানোর অভিযোগ রয়েছে। কোনো অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের কীভাবে অগ্রসর হবে তা নির্ভর করে দুদক নেতৃত্বের নির্দেশনা ও কিছু ক্ষেত্রে সরকারের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বা অবস্থান সম্পর্কে দুদকের ধারণার ওপর। এ ছাড়া দুদকের কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলারও অভিযোগ রয়েছে।

কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, প্রমাণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইচ্ছার ঘাটতি থেকে এটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং কোনো মামলার ক্ষেত্রে এই বিলম্ব ইচ্ছাকৃত না অজ্ঞতাপ্রসূত সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। খুব কমসংখ্যক অভিযোগকারী (২৫ শতাংশের কম) নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে আগ্রহী। মূলত হয়রানি এড়ানোর জন্য বা প্রতিশোধের ভয় থেকে পরিচয় গোপন রাখা হয় বলে ধারণা করা হয়।

ক্ষেত্র ৪ : অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের

এ ক্ষেত্রে নয়টি নির্দেশকের মধ্যে তিনটির স্কোর 'উচ্চ', দুটির স্কোর 'মধ্যম' ও চারটির স্কোর 'নিম্ন'। দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুদকের সাড়া প্রদানের হার কম হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে দুদকের অভিযোগ বাছাই-ব্যবস্থা। দেখা গেছে, ২০১৬-২০১৮ সালে মোট ৪৭ হাজার ৫৪৯টি অভিযোগের মধ্যে ৩ হাজার ২০৯টি অভিযোগ (৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ) অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত হয়, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে ৬৬ শতাংশের বেশি হওয়ার কথা। তবে দুদকের মতে, অধিকাংশ অভিযোগ দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধের মধ্যে পড়ে না। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ২ হাজার ৩৬৯টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগে পাঠানো হয়। এ ছাড়া দুদক ২০১৬-২০১৮ সালে ৪ হাজার ৩৮টি অনুসন্ধানের মধ্য থেকে ৮৪৮টি মামলা (২১ শতাংশ) করেছে (আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ৭৫ শতাংশের বেশি)। অপরদিকে গত কয়েক বছরে দুদকের দুর্নীতির মামলায় সাজা হওয়ার হার গড়ে ৪০ থেকে বেড়ে ৫৭ দশমিক ৭ শতাংশ হলেও তা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের থেকে (৭৫ শতাংশের বেশি) এখনো কম। গত তিন বছরে (২০১৬-১৮) নিষ্পত্তি হওয়া ৮৫৭টি মামলার মধ্যে মোট ৪৯৫টিতে সাজার রায় হয়েছে।

একই ধরনের মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে দুদকের নিরপেক্ষতার বিষয়ে মানুষের ধারণা খুব ইতিবাচক নয়। দুদকের কর্মকর্তাদের মতে, দুদকের ওপর আস্থার অভাব রয়েছে। বিশেষজ্ঞ,

নাগরিক সমাজের সদস্য ও সাংবাদিকদের মতে, দুদককে দুর্নীতি দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হলেও একই ধরনের দুর্নীতির মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি নিরপেক্ষ নয়। জনগণের ধারণায় দুদক ক্ষুদ্র দুর্নীতির ওপর বেশি মনোযোগী এবং 'বড় দুর্নীতিবাজ' ধরার ক্ষেত্রে দুদকের দৃশ্যমান সাফল্য নেই।

দুদকের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও পেশাদারত্বও উদ্বেগের বিষয়। সাধারণত দেখা যায়, দুদকের তদন্তগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় না। অনুসন্ধান ও তদন্তকাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে ঘুষ লেনদেন ও দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে। মামলা দায়ের ও শাস্তির হার বিবেচনায় দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্ত এখনো মানসম্মতভাবে দক্ষ ও পেশাদার নয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের পরিমাণের (২০১৫ সালে প্রায় ৫৯০ কোটি মার্কিন ডলার) পরিপ্রেক্ষিতে দুদকের উদ্ধারকৃত অর্থের পরিমাণ (জরিমানা ও আটক হিসাবে ২০১৮ সালে ১৫৩ দশমিক ২৯ কোটি টাকা) উল্লেখযোগ্য নয়।

ক্ষেত্র ৫ : প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ

এ ক্ষেত্রে আটটি নির্দেশকের মধ্যে চারটির স্কোর 'উচ্চ' ও চারটির স্কোর 'মধ্যম'। ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিরোধ, শিক্ষা ও প্রচার কার্যক্রমের জন্য ২৬ দশমিক ৭৯ কোটি টাকা (দুদকের বাজেটের প্রায় ২ দশমিক ৬৫ শতাংশ) বরাদ্দ করা হয়েছে, যা পর্যাপ্ত নয়। এ ছাড়া দুদক গত তিন বছরে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুপ্রক ও সততা সংঘগুলোর মাধ্যমে বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। কিন্তু এর প্রচার ও প্রতিরোধ কার্যক্রমের জন্য কোনো সমন্বিত পরিকল্পনা নেই। এ ছাড়া স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুপ্রক ও সততা সংঘগুলোর মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমগুলো এখনো মূলত উপলক্ষভিত্তিক (যেমন আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস ও দুর্নীতি দমন সপ্তাহ পালন করা) এবং আনুষ্ঠানিক প্রকৃতির। এ ছাড়া দুদকের পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনায় (২০১৭-২০২১) জোর দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিরোধ ও শিক্ষামূলক কৌশল অনুসৃত হয়নি এবং দুদকের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম স্থানীয় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি পর্যায়ের ওপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া দুদকের এবিষয়ক বার্ষিক পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয় না।

দুদকের নিজস্ব গবেষণা শাখা গঠনের বিষটি প্রক্রিয়াধীন। তবে ২০১৮ সালে দুদক প্রথমবারের মতো দুর্নীতির ওপর তিনটি গবেষণা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ নিলেও এখনো কোনো গবেষণা প্রকাশিত হয়নি। দুদকের একটি সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট থাকলেও নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না এবং দুদকের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার সীমিত।

ক্ষেত্র ৬ : সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক

এ ক্ষেত্রে ছয়টি নির্দেশকের মধ্যে তিনটির স্কোর 'উচ্চ', দুটির স্কোর 'মধ্যম' ও একটির স্কোর 'নিম্ন'। প্রান্তিক জনগণকে (বিশেষ করে নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী) সেবা প্রদানের জন্য দুদকের কোনো লক্ষ্য, কৌশল ও মানদণ্ড নেই। এ ছাড়া দুদক জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যভেদে কোনো ধরনের তথ্যও সংগ্রহ করে না।

দুর্নীতি দমনে দুদকের প্রতি সরকারের সহায়তায় আস্থা মধ্যম মানের। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে 'শূন্য সহনশীলতা'র ওপর জোর দেওয়া হলেও সরকারের কোনো কোনো উদ্যোগের মাধ্যমে দুদকের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে বলে আশঙ্কা রয়েছে। যেমন সরকারি চাকরি আইন ২০১৮-তে সরকারি কর্মচারীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে শূন্য সহনশীলতা নীতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে দুদক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হয় বলে ধারণা রয়েছে। অপরদিকে, দুদক ও অন্যান্য দেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমিত সহযোগিতা রয়েছে। ভুটানের দুর্নীতি দমন কমিশন ও রাশিয়ান ফেডারেশনের ইনভেস্টিগেটিভ কমিটির সঙ্গে দুদকের সমঝোতা স্মারক হয়েছে। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও ভারতের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুদক নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে দুদকের শক্তিশালী দিকগুলো হচ্ছে এর প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, কাজের আওতা, আইনি স্বাধীনতা, কমিশনারদের নিয়োগ ও অপসারণের বিষয়। আর্থিক ও মানবসম্পদের ক্ষেত্রে দুদকের বাজেটের পর্যাপ্ততা, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা রয়েছে। এ ছাড়া তাদের ভালো কর্মী নিয়োগব্যবস্থা এবং স্থায়ী কর্মী বাহিনী রয়েছে। অপরদিকে জবাবদিহি ও শুদ্ধাচারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দুদক বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে, তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করে এবং নিজেদের কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলাসংক্রান্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে অভিগম্যতা, স্বপ্রণোদিত তদন্ত, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার সক্ষমতা ও ইচ্ছা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুদকের প্রতিরোধ, শিক্ষা ও বহির্মুখী কার্যক্রমটি বেশ শক্তিশালী। দুর্নীতি প্রতিরোধ শিক্ষা ও উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা ও সুপারিশ এবং প্রচারণাসহ নানা প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি রয়েছে। অংশীজনদের সঙ্গে সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুদকের অন্যান্য শুদ্ধাচার নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওর সঙ্গে সহযোগিতা রয়েছে এবং দুদক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক বজায় রাখে।

দুদকের দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে জাতীয় বাজেটের তুলনায় বাজেট বরাদ্দের অনুপাত যা অপর্যাপ্ত। দুদকের বাহ্যিক কোনো পর্যবেক্ষণব্যবস্থা নেই এবং দুদকের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার অভিযোগ বিদ্যমান। অভিযোগকারীরা নিজেদের পরিচয় প্রকাশে আগ্রহী নয়, যা দুদকের প্রতি তাদের আস্থাহীনতা বা নিরাপত্তাহীনতা বোধের নির্দেশ করে। দুর্নীতির অভিযোগের সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে দুদকের দুর্বলতা রয়েছে। এ ছাড়া অভিযোগ দায়েরের হারের তুলনায় মামলা দায়েরের হার কম। নারী, দরিদ্রসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা মেটানোর কোনো কাঠামো নেই। সার্বিকভাবে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের ধারণা খুব আশাব্যঞ্জক নয় এবং এটি আস্থাহীনতাকেই নির্দেশ করে।

২০১৬ সালে করা দুদকের প্রথম মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন সার্বিকভাবে ৬১ দশমিক ২২ শতাংশ স্কোর পেয়েছিল, যা মধ্যম পর্যায়ের ছিল। পূর্ববর্তী স্কোর বিবেচনায় এবার তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই। দুদক কর্মী নির্বাচন, অভিযোগ দায়েরের অভিগম্যতা, শাস্তির হার, দুর্নীতির ঝুঁকি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রচার-প্রচারণা, অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা এই নির্দেশকগুলোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি করেছে। অপরদিকে, দুদকের ক্ষমতার রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার, তদন্ত ও মামলা করায় দক্ষতা, দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা, অনুসন্ধান, তদন্তকাজে দক্ষতা ও পেশাদারত্ব, প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রমের বাজেট, সরকারের সহায়তায় আস্থা এই নির্দেশকগুলোর ক্ষেত্রে স্কোর কমেছে। এ ছাড়া দুদক বাজেটের অনুপাত ও বাহ্যিক পর্যবেক্ষণব্যবস্থা নির্দেশকে আগের তুলনায় কম স্কোর পেয়েছে।

দুর্নীতির অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশে অনাগ্রহ, সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ, সরকারের সহায়তায় আস্থা, দুদকের কর্মক্ষমতা, দুদকের ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার ইত্যাদি নির্দেশক 'নিম্ন' বা 'মধ্যম' স্কোর পেয়েছে, যা দুর্নীতি হ্রাসে দুদক ও সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতি জনগণের আস্থার ঘাটতি নির্দেশ করে। তদন্ত ও মামলা পরিচালনায় দক্ষতা ও পেশাদারত্বের উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ ও মামলা পরিচালনার জন্য আরও বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং এ জন্য দুদকের বাজেট চাহিদা ও বরাদ্দ আরও সুচিন্তিত হওয়া প্রয়োজন।

দুদকের প্রধান দুটি ম্যান্ডেটের মধ্যে প্রতিরোধকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে দুর্নীতি দমন দুর্বল হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুদকের কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেন, দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্যমান।

সুপারিশ

স্বাধীনতা ও মর্যাদা

১. **সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন :** দুদকের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইন (দুদক আইন ২০০৪, অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২, সরকারি চাকরি আইন ২০১৮) সংশোধন করে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে−

- দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের নিয়োগ আরও স্বচ্ছ করার জন্য নিয়োগের আগে বাছাইকৃতদের নাম ও জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ, তাদের নিয়ে গণশুনানির আয়োজন ও তা সম্প্রচার করা;
- অর্থ পাচার ও ব্যক্তিমালিকানাসহ বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে দুদকের কাজের আওতাভুক্ত করা;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য দুদকের সুপারিশকে বাধ্যতামূলক করা;
- উচ্চতর শুদ্ধাচার ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনপ্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি স্বাধীন কমিটি তৈরি করা, যার সদস্যরা দুদকের কার্যক্রম তদারকি, নিয়মিত মূল্যায়ন ও দিকনির্দেশনা দেবেন;
- পূর্বানুমতি ছাড়া সরকারি কর্মচারীদের গ্রেপ্তার না করার বিধান রহিত করা।

অর্থ ও মানবসম্পদ

২. **বাজেট :** নিম্নলিখিত কার্যক্রমের জন্য দুদকের বাজেট বাড়াতে হবে :

- অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ।
- দুদকের কর্মীদের প্রশিক্ষণ।
- প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম (যেমন গণশুনানি, গবেষণা ইত্যাদি)।
- সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ।

৩. **দক্ষ কর্মী :** অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং প্রতিরোধ কার্যক্রমের জন্য কর্মীদের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৪. **প্রশিক্ষণ :** দুদকের কর্মী, বিশেষ করে যারা তদন্ত, মামলা পরিচালনা ও প্রতিরোধের কাজে জড়িত, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দুদকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। দুদকের তদন্তকারী কর্মকর্তাদের জন্য বনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং দুদকের প্যানেল আইনজীবী, বিশেষ করে জেলা পর্যায়ের আইনজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার

৫. **প্রক্রিয়া অনুসরণ :** একই ধরনের দুর্নীতির মামলার ক্ষেত্রে দুদককে একই ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৬. **আচরণবিধি প্রণয়ন :** দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সমন্বিত ও বিশেষায়িত আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে। এখানে দুদক কর্মীদের সম্পত্তির ঘোষণা, স্বার্থের সংঘাত, উপহার ও সেবা, চাকরি-পরবর্তী বাধানিষেধ, আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা, অন্যান্য অসদাচরণ ও অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের

৭. **দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ :** দুদককে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিযোগ বাছাই কী মাপকাঠিতে হচ্ছে এবং কোনো অভিযোগ কেন গ্রহণ করা হলো না তার ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে হবে।

৮. **মামলা করার হার :** দুদককে তার মামলার হার বাড়ানোর জন্য নিচের পদক্ষেপ নিতে হবে :

– দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে সঠিক অনুসন্ধান পরিচালনা, পদ্ধতিগত ভুল না করা, মামলা দায়েরের আগে আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করা;

– দুর্নীতিপ্রবণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনার সময় এবং গণশুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুদককে ওই প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবাজ কর্মীদের চিহ্নিত করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

– প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ফলোআপ এবং প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৯. **দক্ষতা ও পেশাদারত্ব :** দুদককে আইনে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত শেষ করতে হবে এবং এ কাজ করার সময় পেশাদারত্ব ও উৎকর্ষের প্রমিত মান বজায় রাখতে হবে।

১০. **সাজার হার বৃদ্ধি :** দুর্নীতির মামলায় দোষীদের সাজার হার কীভাবে বাড়ানো যায় সে জন্য দুদককে তদন্ত ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিত করা, মামলা দায়েরের আগে প্রয়োজনবোধে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করা, প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও তদারকি করতে হবে। দুদককে আরও দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনবোধে বেশি ফি দিয়ে হলেও মামলায় ভালো আইনজীবীদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. **সম্পদ পুনরুদ্ধার :** দুদককে দুর্নীতির মামলাগুলো থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার, জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করার জন্য উদ্যোগী হয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রতিরোধমূলক, শিক্ষামূলক ও আউটরিচ কার্যক্রম

১২. **প্রতিরোধ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম :** বার্ষিক প্রতিরোধ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুদককে এর পাঁচ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে।

১৩. **গবেষণা :** দুদককে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ এবং দক্ষ জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে তার গবেষণা বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে এবং দুর্নীতির ঝুঁকি, প্রেক্ষাপট ও অবস্থা চিহ্নিত করতে নিজস্ব গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। দুদকের কার্যক্রমের কার্যকারিতা বিষয়ে জনগণের ধারণা যাচাইয়ের জন্য জরিপ ও গবেষণার কাজ হাতে নিতে হবে।

১৪. **জনগণের আস্থা :** দুদকের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করার জন্য দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে আরও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে, দুদকের কমিশনার ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আয়, সম্পদ ও দায়ের বিবরণ প্রকাশ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে, 'শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত'দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং দুর্নীতির মামলার কার্যকর ও সময় অনুযায়ী তদন্ত ও দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক

১৫. **অন্যান্য দেশের সঙ্গে সহযোগিতা :** দুদককে অন্যান্য দেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদের অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

১৬. **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টিপাত :** দুদককে বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে তাদের সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রযোজ্য আইন ও বিধির মধ্যে পেনাল কোড ১৮৬০, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর অ্যাক্ট ১৮৯৮, অ্যান্টি-করাপশন অ্যাক্ট ১৯৪৭, ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৪৭, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯, জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন ২০১১ এবং ক্রাইম রিলেটেড মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স অর্ডিন্যান্স ২০১২ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া যেসব নীতিমালা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে এর মধ্যে রয়েছে তথ্য অধিকার নীতিমালা, জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা, নাগরিক সনদ ও অভিযোগ নিরসনব্যবস্থা।

২ *বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ২০ (২)।

৩ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, *পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১*, http://www.plancomm.gov.bd/perspective-plan/ (১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।

৪ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, *সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : ২০১৬ - ২০২০ অর্থবছর*, http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2015/10/7th_FYP_18_02_2016.pdf (১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।

৫ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআইবি, ২০১৮, *সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭*, https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2018/report/nhs/NHS_2017_Full_Report_BN.pdf (১ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

৬ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, *দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৮*।

৭ বাংলাদেশ এই ধারণাসূচকের একেবারে নিচে ছিল ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত টানা পাঁচ বছর। ২০১১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্কোর ২৪ থেকে ২৭-এর মধ্যে ওঠানামা করেছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ইফতেখারুজ্জামান, 'বাংলাদেশ ডিসেন্ডস ইন করাপশন র‍্যাংকিং : জিরো টলারেন্স - হোয়াট নেক্সট?', *দ্য ডেইলি স্টার*, ৩০ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.thedailystar.net/opinion/governance/news/bangladesh-descends-corruption-ranking-1694551 (১১ মার্চ ২০১৯)।

৮ বিশ্বব্যাংক, *দি ওয়ার্ল্ডওয়াইড গভার্নেন্স ইন্ডিকেটরস, ২০১৮ আপডেট*, info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx?fileName=wgidataset.xlsx (১১ মার্চ ২০১৯); ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ, *এন্টারপ্রাইজ সার্ভেস বাংলাদেশ, ২০১৩;* https://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2013/bangladesh (১১ মার্চ ২০১৯)।

৯ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, ২০১৮, *দি গ্লোবাল কমপিটিটিভনেস রিপোর্ট ২০১৮*, http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf (১ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

১০ শেখ তৌফিক এম হক এবং শেখ নূর মোহাম্মদ, 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কালচার অ্যান্ড ইনসিডেন্স অব করাপশন ইন বাংলাদেশ : আ সার্চ ফর দ্য পলিটিক্যাল লিংকেজ', *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন*, ভলিউম ৩৬, নং ১৩, ২০১৩, পৃ. ৯৯৮।

১১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০০-১০০১।

১২ স্ট্যানলি এ কোচানেক, *প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট পলিটিকস অ্যান্ড বিজনেস ইন বাংলাদেশ*, নিউ দিল্লি : সেজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৩, পৃ. ২৫১-২৬৮।

১৩ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধসংক্রান্ত কার্যালয়, *জাকার্তা স্টেটমেন্ট অন প্রিন্সিপালস ফর অ্যান্টি-করাপশন এজেন্সিস*, ২৬-২৭ নভেম্বর ২০১২, https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf.

ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় *

মো. জুলকারনাইন, অমিত সরকার ও মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

গবেষণার প্রেক্ষাপট

সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের পূর্বশর্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে পুঞ্জীভূত করে সফলভাবে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে রূপান্তর করে দেশের পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ব্যাংকগুলো একটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণের আমানতকৃত অর্থ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করলেও এই সঞ্চিত অর্থের ওপর আমানতকারীদের সরাসরি কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আমানতকারীদের পক্ষ থেকে এই আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বা তদারকি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।[১] বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২-এর মাধ্যমে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ ও আন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুসারে কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণী ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হিসেবে ব্যাংকিং খাত তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশে ব্যাংকের সংখ্যা ও এর শাখার সংখ্যা, সঞ্চয় ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাংকিং খাত উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, জ্বালানি, পরিবহন ইত্যাদি উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। তবে ব্যাংকিং খাত থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমানতকারী তথা সাধারণ জনগণের অর্থ দীর্ঘদিন ধরেই খেলাপি ঋণের মাধ্যমে আত্মসাৎ হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে খেলাপি ঋণ উল্লেখযোগ্য হারে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও ২০১২ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে খেলাপি ঋণের হার পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই খেলাপি ঋণ অনেক ক্ষেত্রেই অনিচ্ছাকৃত ও ব্যবসাসংকটজনিত নয়। বিভিন্ন সময়ে খেলাপি ঋণ হ্রাস এবং ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও তার যথাযথ কার্যকর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি; বরং ঋণখেলাপিদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও খেলাপি ঋণ কম দেখাতে বিবিধ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এক দশকে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে বহুলভাবে প্রকাশিত ব্যাংকিং খাতের চলমান অস্থিরতা ও নৈরাজ্য তথা অনিয়ম-দুর্নীতি, ঋণ জালিয়াতি, খেলাপি ঋণের উচ্চহার রোধ করতে না পারা এবং ব্যাংকগুলোয় সংঘটিত অনিয়ম-

* ২০২০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে না পারা ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমের কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়, ২০১০-২০১৫ সালের মধ্যে সরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের অস্বাস্থ্যকর প্রবৃদ্ধির কারণে সরকারকে বাধ্য হয়েই ২০১৩ ও ২০১৪ সালে মোট ৭৫ বিলিয়নের অধিক পরিমাণ টাকা পুনঃমূলধন হিসেবে জোগান দিতে হয়েছিল। এ ছাড়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যাংকিং খাতে সুশাসন উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, সরকারি ব্যাংকের তদারকি, মোট খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনা এবং নিয়ন্ত্রণকাঠামোর মান বৃদ্ধির জন্য কার্যাবলি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কার্যকর ও স্বায়ত্তশাসিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিকাঠামোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[২] ‘পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১’-এ আইনের শাসন ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।[৩] জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ (এসডিজি)-এর অভীষ্ট ১৬-তে সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ (লক্ষ্যমাত্রা ১৬ দশমিক ৬) এবং সব ধরনের দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস (লক্ষ্যমাত্রা ১৬ দশমিক ৫) করার কথা বলা হয়েছে।[৪] কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ ও গণমাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়গুলো উঠে এলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের এ-সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে সুশাসনের ঘাটতি বিষয়ে নিবিড় গবেষণার অভাব রয়েছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ খাত, প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণাসহ বিভিন্ন ধরনের অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংকিং খাতের তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের ঘাটতি ও এর কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে। খেলাপি ঋণকে কেন্দ্র করে দেশের ব্যাংকিং খাতে যে নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজ করছে তা পরিবর্তন তথা ব্যাংকিং খাতে অনিয়ম দূরীকরণে ও সুশাসন বাস্তবায়নে কার্যকর নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা সুসংহত করতে পারলে এই খাতের সুষ্ঠু পরিবেশ ও টেকসই স্থিতিশীলতা যেমন নিশ্চিত করা যাবে, তেমনি সার্বিকভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে–

- নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিসংশ্লিষ্ট আইনি ও নীতিকাঠামো পর্যালোচনা করা;
- নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে সুশাসনের ঘাটতি ও এর কারণ চিহ্নিত করা; এবং
- গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

এই গবেষণায় রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ভূমিকা পর্যালোচনা করে সুশাসনের বিভিন্ন সূচকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিদ্যমান খেলাপি ঋণের পরিমাণ বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকগুলোর মধ্যে থেকে শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকিং কার্যক্রম বিশেষত ঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি-সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিকাঠামো, এ-সংশ্লিষ্ট তদারকি কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভাগগুলোর কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। যার মধ্যে ব্যাংকিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে নীতি ও প্রবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া, অফসাইট তদারকি, ঋণ তথ্য পর্যালোচনা, অনসাইট তদারকি, সমন্বিত তত্ত্বাবধানব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া তদারকি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকাও (রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন, ব্যবসায়ী, ঋণ গ্রহীতা ইত্যাদি) পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় ২০১০ থেকে ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত উল্লিখিত কার্যক্রম বিবেচনা করা হয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি

এ গবেষণাটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা, তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয় ও তথ্যদাতার ধরনভেদে পৃথক চেকলিস্ট ব্যবহার করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, বাণিজ্যিক ব্যাংকের পর্ষদের পরিচালক, ব্যাংক ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও সাংবাদিক। সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন ও গবেষণা নিবন্ধ, বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক দলিল ইত্যাদি থেকে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল জানুয়ারি ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত।

এই গবেষণায় বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে ব্যবহৃত নির্দেশকগুলো হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা, তদারকি সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ।

সারণি ১ : গবেষণায় ব্যবহৃত সুশাসনের নির্দেশক ও উপনির্দেশক

সুশাসনের নির্দেশক	উপনির্দেশক/ক্ষেত্রসমূহ
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা	**আইনিকাঠামো :** প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির স্বাধীনতা, সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা, নীতি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।
	বাহ্যিক প্রভাবক : আইন ও ব্যাংকিং নীতি প্রণয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ গঠন, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে সরকার, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের ভূমিকা।
তদারকি সক্ষমতা	নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা, দায়িত্ব বা ক্ষমতা অর্পণ, তদারকি কৌশল (অফসাইট ও অনসাইট তদারকি) এবং জনবল ও কারিগরি সক্ষমতা।
স্বচ্ছতা	ব্যাংকিং প্রতিবেদন, নীতি প্রণয়নের ব্যাখ্যা, সভার কার্যবিবরণী ও ভোটসংক্রান্ত তথ্য এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ।
জবাবদিহি	পরিচালনা পর্ষদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়া।
অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ	তদারকি কাজে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, ক্ষেত্র, কারণ, অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ, স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের চিত্র

২০০৯ সালের শুরুতে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা[৫], যা সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ১৬ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা।[৬] অর্থাৎ ওই সময়ে বছরে গড়ে ৯ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা খেলাপি হয়েছে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৪১৭ শতাংশ, যদিও একই সময়ে মোট ঋণ বৃদ্ধির হার ৩১২ শতাংশ। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী জুন ২০১৯ পর্যন্ত খেলাপি ঋণের (১১২,৪২৫ কোটি টাকা) সঙ্গে বারবার পুনর্গঠিত ও পুনঃতফসিলীকৃত এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রাপ্ত খেলাপি ঋণ যোগ করে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের প্রকৃত পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৪০ হাজার ১৬৭ কোটি টাকা।[৭] অপর একটি প্রতিবেদন অনুসারে আইএমএফ উল্লিখিত খেলাপি ঋণের এই পরিমাণের সঙ্গে অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ (৫৪,৪৬৩ কোটি টাকা) যোগ করে জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকা।[৮]

এই বিপুল পরিমাণ ঋণ বর্তমান ব্যাংকিং খাতে অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন সময়ে খেলাপি ঋণ হ্রাস এবং ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও তা কার্যকর না করে

সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বারবার খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ ও পুনর্গঠনের সুযোগ প্রদান করা হয়। সর্বশেষ মে ২০১৯-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি নির্দেশনায় খেলাপি ঋণের মাত্র ২ শতাংশ ফেরত দিয়ে পুনঃতফসিলীকরণের মাধ্যমে ১০ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হয়।[৯] এভাবে পুনঃতফসিলের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ আদায় না করেই সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ কমিয়ে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ৯২ হাজার ৫১০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ হিসেবে দেখানো হয়।[১০] ঋণখেলাপিদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও খেলাপি ঋণ কম দেখাতে বিবিধ কৌশল অবলম্বন সত্ত্বেও জুন ২০২০-এ খেলাপি ঋণের পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৬ হাজার ১১৭ কোটি টাকা।[১১] রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে খেলাপি ঋণের কারণে সৃষ্ট মূলধন ঘাটতি মেটাতে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সরকার কর্তৃক ১২ হাজার ৪৭২ কোটি ৮৭ লাখ টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়।[১২]

চিত্র ১ : বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের বছরভিত্তিক চিত্র (কোটি টাকা)

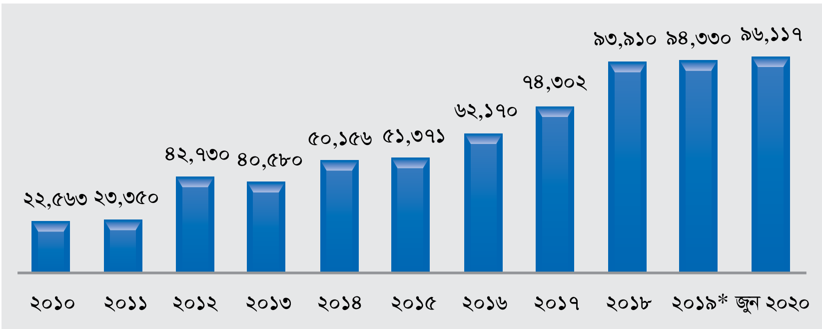

সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ খেলাপি ঋণ ছিল ১১৬,২৮৮ কোটি টাকা; পরবর্তী সময়ে পুনঃতফসিলীকরণের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ হ্রাস করে ডিসেম্বর ২০১৯-এ ৯৪ হাজার ৩৩০ কোটি টাকা দেখানো হয়

খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে এই বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও আমানতকারীদের স্বার্থসংরক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণায় প্রধানত দুই ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ; যার মধ্যে রয়েছে আইনি সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও ব্যবসায়িক প্রভাব। আর অপরটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ, যার মধ্যে রয়েছে তদারকি সক্ষমতায় ঘাটতি, নেতৃত্বের সক্ষমতায় ঘাটতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি এবং তদারকি কাজে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীন ও পর্যাপ্ত ক্ষমতা তদারকির ক্ষেত্রে কার্যকর ফলাফল নিয়ে আসে। কার্যকর তদারকির জন্য শক্তিশালী ও স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক

স্বাধীনভাবে ব্যাংক খাত তদারকি ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনটি বাধা লক্ষ করা যায় :

আইন ও নীতিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা : বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিকাঠামোর কিছু সীমাবদ্ধতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতাকে খর্ব করে, নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকাকে সীমিত করে এবং ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ : ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ব্যবসায়ী অংশ কর্তৃক তাদের ইচ্ছা অনুসারে আইন পরিবর্তন, ব্যাংকিং খাতে ব্যবসায়ীদের অবাধ প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালন প্রক্রিয়া প্রভাবিত করা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতাকে খর্ব করা।

ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব : একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, তাদের ইচ্ছা অনুসারে ব্যাংকিং নীতি প্রণয়ন ও পরিবর্তন, বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য করা, তদারকি নিয়ম-নীতি উপেক্ষা ও আইনের লঙ্ঘন এবং ঋণ গ্রহণে সিন্ডিকেট তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা খর্ব করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা : আইনি সীমাবদ্ধতা

ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য আইন ও অধ্যাদেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১, অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩, দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশন অর্ডার, ১৯৭২ ইত্যাদি। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত প্রুডেনশিয়াল প্রবিধানের (Prudential regulation) মধ্যে রয়েছে, মূলধন পর্যাপ্ততা নীতি, ঋণ শ্রেণীকরণ ও নিরাপত্তা সঞ্চিতি নীতি, একক বৃহত্তম ঋণসীমা নীতি, ঋণ পুনঃতফসিল নীতি, অবলোপন নীতি, ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় করপোরেট গভর্নেন্স, ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগসহ বিভিন্ন কমিটি গঠন নীতিমালা ও গাইডলাইন ইত্যাদি। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য বিদ্যমান আইনকাঠামোতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতাকে খর্ব করে, নিয়ন্ত্রণ ও তাদরকি কার্যক্রমকে দুর্বল বা সীমিত করে এবং রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে। আইনের এসব সীমাবদ্ধতা ব্যাংকিং খাতে কতিপয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয় এবং খেলাপি ঋণকে বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। নিচে এসব আইনের সীমাবদ্ধতা একটি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

সারণি ২ : ব্যাংক ঋণসংক্রান্ত আইন পর্যালোচনা

<table>
<tr><th>বিষয়</th><th>সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা</th><th>সীমাবদ্ধতা/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ/ ফলাফল</th></tr>
<tr><td colspan="3">বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২</td></tr>
<tr><td rowspan="2">গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ ও অপসারণ</td><td>সরকার নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগের কথা বলা হয়েছে [ধারা ১০(৩)(৪)]</td><td rowspan="4">• চারটি ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও অনুকরণীয় চর্চা অনুসরণে ঘাটতি
• নিয়োগ ও অপসারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট না থাকায় স্বচ্ছতার ঘাটতি
• অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাজনৈতিক বিবেচনায় গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ও পর্ষদ সদস্য নিয়োগ; চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের ঘাটতি
• ব্যক্তি বিশেষে যোগ্যতার শর্ত পরিবর্তন
• পর্ষদে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার আধিক্য
• উল্লিখিত বিষয়গুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করে</td></tr>
<tr><td>আইনে উল্লিখিত যোগ্যতার শর্ত পূরণে ব্যর্থ, দায়িত্ব পালনে অসমর্থ, অর্পিত বিশ্বাস ভঙ্গ বা বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থি কাজে লিপ্ত হলে সরকার তাকে অপসারণ করতে পারবে [১৫(১)]</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পর্ষদ গঠন ও বিলুপ্তকরণ</td><td>গভর্নর, একজন ডেপুটি গভর্নর, সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন সরকারি কর্মকর্তা ও এর বাইরে চারজন (সরকারের মতে যাদের ব্যাংকিং, ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে) [৯(৩)]</td></tr>
<tr><td>আইন কর্তৃক নির্ধারিত কোনো দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যর্থ বলে সরকারের কাছে প্রতীয়মান হলে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সমগ্র পরিচালনা পর্ষদকে রহিত করার ক্ষমতা সরকারের, [৭৭(১)][১৩]</td></tr>
<tr><td>প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা</td><td>বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে সাধারণ তদারকি ও পরিচালনা ক্ষমতা একটি পরিচালনা পর্ষদের হাতে ন্যস্ত থাকবে [৯(২)] [১৪]</td><td>পর্ষদের কাঠামো ও এর গঠন-প্রক্রিয়ার আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে এই ক্ষমতার স্বাধীন চর্চা বা প্রয়োগকে সীমিত করেছে</td></tr>
</table>

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

বিষয়	সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা	সীমাবদ্ধতা/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ/ফলাফল
ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১		
বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ক্ষমতা	ব্যাংক বা আমানতকারীদের স্বার্থবিরোধী ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হলে তা প্রতিরোধে যেকোনো ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালক বা প্রধান নির্বাহীকে অপসারণের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের থাকলেও [ধারা ৪৬(১)], রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রযোজ্য নয় [৪৬ (৬)]	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক তদারকির এ সীমাবদ্ধতা ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকে খর্ব করে যা ব্যাসেল মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক
সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা পালনে একাধিকবার ব্যর্থ বা আমানতকারীর ক্ষতি করছে এমন ব্যাংককে অধিগ্রহণ, সাময়িক স্থগিতকরণ, একত্রকরণ বা পুনর্গঠনের ক্ষমতা সরকারের ওপর ন্যস্ত [ব্যাংক কোম্পানি আইন, ধারা ৫৮, ৭৭][১৫]	বিধিবিধান লঙ্ঘনকারী ব্যাংক অধিগ্রহণ, অবসায়ন বা সাময়িক বন্ধের ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা খর্ব করে

ব্যাংক তদারকির আইনি কাঠামোতে ব্যাসেল নীতি অনুসরণে ঘাটতি : ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিপ্রবণ সম্পদ হ্রাস ও আর্থিক অবস্থাকে দৃঢ় করতে কিছু আদর্শ বা নিয়ম নিয়ে দ্য ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন ১৯৭৪ সাল থেকে কাজ করছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনে ব্যাংক তদারকিবিষয়ক ধারাগুলো ব্যাসেল কমিটি কর্তৃক প্রণীত ব্যাংক তদারকি সম্পর্কিত কার্যকর মূলনীতি ১ ও ২ (কোর প্রিন্সিপালস অব ইফেকটিভ ব্যাংকিং সুপারভিশন)-এ নির্ধারিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা, উদ্দেশ্য, দায়িত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

সারণি ৩ : ব্যাসেল নীতির সাপেক্ষে বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক আইন পর্যালোচনা

ব্যাসেল নীতি	বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক আইন	
	নীতির উপস্থিতি	ঘাটতি
তদারকি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য (সুস্থ ও নিরাপদ ব্যাংকিংব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা) নির্ধারণ	আংশিক	ব্যাংক তদারকিবিষয়ক প্রাথমিক উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি
তদারকি প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা, জবাবদিহি ও পরিচালনাকাঠামো নির্ধারণ	আংশিক	আইনে সরকারি হস্তক্ষেপের সুযোগ বিদ্যমান

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ব্যাসেল নীতি	বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক আইন	
	নীতির উপস্থিতি	ঘাটতি
প্রধান নির্বাহী ও পর্ষদ সদস্য নিয়োগ এবং অপসারণের প্রক্রিয়া সুস্পষ্টকরণ	×	আইনে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি
তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা প্রদান	আংশিক	ব্যাংক অবসায়ন/একত্রকরণ ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালক অপসারণের ক্ষমতা নেই
বিধিবিধানের প্রতিপালন নিশ্চিতে যেকোনো ব্যাংকে প্রবেশের ক্ষমতা প্রদান	√	ক্ষমতা থাকলেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ
প্রুডেনশিয়াল মানদণ্ড নির্ধারণ এবং তা সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদান	√	ক্ষমতা থাকলেও নীতি দখলের চর্চা বিদ্যমান

খেলাপি ঋণ সংশ্লিষ্ট আইন বা নীতির অনুপস্থিতি

'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি'র সংজ্ঞা এবং উপযুক্ত মাত্রায় শাস্তি নির্ধারণ না করা : বাংলাদেশের প্রচলিত আইনিকাঠামোতে সাধারণভাবে খেলাপি ঋণ গ্রহীতার সংজ্ঞা নির্ধারিত থাকলেও ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে কারা চিহ্নিত হবে, সে বিষয়ে আইনিকাঠামোতে কোনো মানদণ্ড কিংবা সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি এবং ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হওয়াকে আইনে সুনির্দিষ্টভাবে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা ও ঋণের পরিমাণভেদে শাস্তি নির্ধারণ হয়নি। ফলে সরকার কর্তৃক খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধারে ঋণখেলাপিদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাদি ও প্রণোদনা সংশ্লিষ্ট সবার জন্য প্রযোজ্য হওয়ায় ঢালাওভাবে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিরাও ভোগ করে থাকে।

সার্বিকভাবে ব্যাংকিং খাতে ব্যক্তি ও গ্রুপের সর্বোচ্চ ঋণসীমা নির্ধারণ : একক ব্যক্তি বা গ্রুপ একটি ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ কী পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে তা একক বৃহত্তম ঋণসীমা নীতিমালায় নির্ধারিত হলেও একক ব্যক্তি বা গ্রুপ সার্বিকভাবে ব্যাংকিং খাত থেকে কী পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে, সে বিষয়টি উল্লেখ না থাকার সুযোগে ঋণ গ্রহীতারা, বিশেষ করে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিরা বিভিন্ন কৌশল ও যোগসাজশের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ বের করে নিচ্ছে, যার উল্লেখযোগ্য অংশ পরে খেলাপি হয়ে পড়ছে। বর্তমানে ৭ বা ১০ জন করে শীর্ষ ঋণ গ্রহীতা খেলাপি হলে যথাক্রমে ৩৫টি ও ৩৭টি ব্যাংক মূলধন সংকটে পড়বে।[১৬]

ব্যবসায়ী কর্তৃক আইন ও নীতি দখল

আইন পরিবর্তন ও প্রণয়নে হস্তক্ষেপ : ব্যবসায়ী ও ব্যাংক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের প্রভাবে ব্যবসায়ীদের অনুকূলে আইন পরিবর্তন এবং নানাভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীন নীতি ও বিধিবিধান প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করা হয়, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে

চ্যালেঞ্জ তৈরি ও খেলাপি ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করে। যেমন ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর নিচের ধারাগুলো[১৭] সংশোধনের মাধ্যমে কিছু পরিবারের হাতে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়–

- একই পরিবার থেকে দুজনের পরিবর্তে চারজন পর্যন্ত পরিচালক রাখার বিধান;
- পরিচালকের মেয়াদ পর পর দুইবারে সর্বোচ্চ ছয় বছরের পরিবর্তে পর পর তিনবারে সর্বোচ্চ নয় বছর থাকার বিধান (এ ছাড়া একই পরিবারের চারজন সদস্যের বাইরে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগের সুযোগও বিদ্যমান)।[১৮]

প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন সংশোধন : ব্যবসায়ীদের চাপে এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের বেশ কিছু প্রুডেনশিয়াল প্রবিধানও পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে খেলাপি ঋণ কাগজে-কলমে কম দেখানো যায়, নিয়মিত ঋণ গ্রহীতার চেয়ে ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের জন্য সহজ শর্ত আরোপ করা হয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন পরিশোধ, ঋণ অবলোপন, ঋণ শ্রেণীকরণসংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন।

সারণি ৪ : ঋণসংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তন পর্যালোচনা

নীতিমালা	পরিবর্তন	পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল
ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন পরিশোধ[১৯]	খেলাপি ঋণের ২ শতাংশ ডাউনপেমেন্টের মাধ্যমে ১০ বছরের জন্য পুনঃতফসিল	নিয়মিত ঋণ গ্রহীতার চেয়ে ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের জন্য সহজ শর্ত; নিয়মিত ঋণ গ্রহীতাকে খেলাপি হতে উৎসাহী করা
ঋণ অবলোপন[২০]	মন্দমানের খেলাপি ঋণের সময়কাল পাঁচ বছরের স্থলে তিন বছরে অবলোপনের সুযোগ; শতভাগ নিরাপত্তা সঞ্চিতির বিধান শিথিল	খেলাপি ঋণ কাগজে-কলমে কম দেখানো, খেলাপি ঋণকে উৎসাহিত করা এবং অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ে ব্যাংকের তৎপরতা হ্রাস করা
ঋণ শ্রেণিকরণ[২১]	আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুসরণ না করে শ্রেণিকৃত ঋণের প্রতি ধাপে তিন মাস করে সময় বৃদ্ধি	খেলাপি ঋণ কাগজে-কলমে কম দেখানো, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাংকিং প্রতিবেদনগুলোর বস্তুনিষ্ঠতা হারানো এবং বৈদেশিক লেনদেন বা এলসি বিলের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাবের ঝুঁকি সৃষ্টি

এ ছাড়া, আগ্রাসী ব্যাংকিংয়ের কারণে সৃষ্ট তারল্যসংকট কাটাতে বিভিন্ন অজুহাতে বারবার ঋণ আমানত অনুপাত (এডিআর) হার বৃদ্ধি[২২], নগদ জমা সংরক্ষণ (সিআরআর) ও রেপো রেট

হ্রাসের[২৩] ঘটনা লক্ষ করা যায় এবং সম্প্রতি সময়ে করোনা পরিস্থিতিতে ‘ইন্টার্নাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং’কে শিথিল করে[২৪] ঋণখেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগও সৃষ্টি করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও একই ব্যক্তিকে গভর্নর হিসেবে পুনর্নিয়োগ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ সংশোধন করে গভর্নরের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়।

বাহ্যিক প্রভাব বা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ব্যাংক খাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত ও তদারকি নিয়মনীতি উপেক্ষা করে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় নিচের উপায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোয় কয়েকটি ব্যবসায়ী গ্রুপ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স অর্জন : প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় ২০০৯ সালের পর থেকে ১৪টি নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রভাবিত বা বাধ্য করা হয়। নতুন ব্যাংকগুলোর উদ্যোক্তার মধ্যে মন্ত্রী, সাংসদ ও তাদের পরিবারের সদস্য, ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী, ছাত্রসংগঠনের নেতা, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী বিভিন্ন পেশাজীবী গ্রুপ উল্লেখযোগ্য। নতুন ব্যাংকের ইক্যুইটি ক্যাপিটালের বিনিয়োগকৃত অর্থ আয়কর রিটার্নে ঘোষিত সম্পদ থেকে পরিশোধের বিধান থাকলেও অনেকগুলো ব্যাংকে ‘কালোটাকা’ বিনিয়োগের অভিযোগ রয়েছে।

শেয়ার ক্রয় ও হস্তান্তরে আইন লঙ্ঘন : একক বা যৌথভাবে কোনো ব্যাংকের ১০ শতাংশের বেশি শেয়ার ক্রয় না করার বিধান[২৫] থাকলেও বিভিন্ন ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় বা রাজনৈতিক প্রভাবে বাধ্য করে নামে-বেনামে কতিপয় ব্যবসায়ী কর্তৃক অধিক শেয়ার ক্রয়ের অভিযোগ রয়েছে। একটি ব্যবসায়ী গ্রুপ কর্তৃক ১৪টি প্রতিষ্ঠানের নামে একটি ব্যাংকের ২৮ শতাংশ এবং সাতটি প্রতিষ্ঠানের নামে অপর একটি ব্যাংকের ১৪ শতাংশ শেয়ার ক্রয়। এ বিষয়ে অবগত হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে একটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় রদবদল কাজে অনুমোদন দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের গভীর রাত পর্যন্ত অফিসে অবস্থান। এই ব্যবসায়ীর হাতে নয়টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় পর্ষদ গঠনে আইনের লঙ্ঘন : বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিচালনা পর্ষদ বার্ষিক সাধারণ সভার[২৬] মাধ্যমে নির্বাচনের কথা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পূর্বনির্ধারিত থাকে। একক পরিবারের পরিচালক সীমা লঙ্ঘন করে একাধিক ব্যাংকে একই পরিবারের চারের অধিক পরিচালক নিয়োগ করা হয়। একটি ব্যাংকে স্বামী, স্ত্রী, দুই পুত্র, মেয়ে, নাতিসহ একই পরিবারের ছয়জন পরিচালক রাখা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ব্যাংক পরিচালক হিসেবে ব্যাংকের উদ্যোক্তা বা শেয়ারধারক নন এমন বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগের চর্চা থাকলেও বাংলাদেশে এর বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায়। ব্যাংক পরিচালনায় পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আত্মীয় বা স্বজনদের মধ্যে থেকে অযোগ্য ও অদক্ষ পরিচালক নিয়োগ করা হয়। পরিচালক হতে ব্যাংক বা ব্যবস্থাপনা বা পেশাগতভাবে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা[২৭] থাকা বাধ্যতামূলক হলেও অনেক ব্যাংকে ব্যক্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে অনভিজ্ঞ পরিচালক নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়া আইন লঙ্ঘন করে বিভিন্ন ব্যাংকে একাধিক ঋণখেলাপি পরিচালক বিদ্যমান থাকার নজিরও লক্ষ করা যায়।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনাকাঠামো নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ব্যাংক হলেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নীতিনির্ধারণী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলো অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতাকে খর্ব করতে ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পুনরায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম সীমিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগ অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমেও হস্তক্ষেপ করে থাকে। যেমন অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে একটি বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের অপসারণ স্থগিত করানোর চেষ্টা করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যক্তিদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে এমন লোকদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যারা শুধু বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারিশ সত্ত্বেও একটি ব্যাংকের অভিযুক্ত চেয়ারম্যানকে অপসারণ না করার দৃষ্টান্তও লক্ষ করা যায়।

নিয়মনীতি উপেক্ষা করে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে অনুগত প্রধান নির্বাহী নিয়োগ : বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি উপেক্ষা করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। প্রধান নির্বাহীর পদ তিন মাসের বেশি শূন্য না রাখার বিধান থাকলেও একটি ব্যাংকে এক বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী রাখা হয়। অপর একটি ব্যাংকে পরিচালনা পর্ষদের অযাচিত হস্তক্ষেপে তিন বছরে তিনজন প্রধান নির্বাহী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী নিয়োগে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শ উপেক্ষা : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু অনিয়মের অভিযোগ থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক তার মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আপত্তি জানায়। কিন্তু তাদের আপত্তি উপেক্ষা করে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তাকে পুনর্নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদন দিতে বাধ্য হয়। অপর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি শাখার একজন মহাব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে বহুল আলোচিত একটি ব্যাংক কেলেঙ্কারিতে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাকে পদোন্নতি দিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ওই ব্যাংকে নিয়োগ দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ ঋণখেলাপি এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের যোগসাজশে ও রাজনৈতিক তদবিরের মাধ্যমে অথবা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একাংশের অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

যোগসাজশ বা সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ ও খেলাপি দায় এড়ানো : কতিপয় ব্যবসায়ী-শিল্প গ্রুপ, তাদের নিযুক্ত পরিচালক ও উচ্চপদস্থ ব্যাংকার, রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগকৃত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করা হয়। জাতীয় সংসদের একটি অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী প্রদত্ত তথ্য[২৮] অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত দেশের ৫৫টি ব্যাংক

থেকে ব্যাংকগুলোর পরিচালকরা একে অন্যের ব্যাংক থেকে ১ লাখ ৭১ হাজার ৬১৬ কোটি ১২ লাখ ৪৭ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন, যা ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা মোট ঋণের ১১ দশমিক ২১ শতাংশ। পরিচালকদের নিজ ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ১ হাজার ৬১৪ কোটি ৭৭ লাখ ১৭ হাজার টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ।

এ ছাড়া এসব ব্যাংক পরিচালকের বিরুদ্ধে বেনামেও প্রচুর ঋণ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। এসব ঋণের বিপুল পরিমাণ অংশ পরে খেলাপি হয়ে যায় এবং প্রভাবের মাধ্যমে এই খেলাপি ঋণে বারবার সুদ মওকুফ, পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন ও অবলোপন ইত্যাদি বাড়তি সুবিধা নেওয়া হয়ে থাকে। এসব যোগসাজশ বা সিন্ডিকেশনের কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ওপর অধিক খেলাপি ঋণের বোঝা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, ৫০ শতাংশের অধিক খেলাপি ঋণের বোঝা এই ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ওপর রয়েছে।[২৯] যোগসাজশ থাকার কারণে ঋণখেলাপি পরিচালকের বিরুদ্ধে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংককে নোটিশ প্রদান না করায় ঋণখেলাপি হিসেবে চিহ্নিত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা আদালত থেকে ওই বিষয়ে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে যোগসাজশে বৃহৎ খেলাপি ঋণসংক্রান্ত মামলার কার্যক্রম দুর্বল করার মাধ্যমে ঋণখেলাপির অনুকূলে রায় হয়। যেমন একটি বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নেওয়া প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ৫ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ, যা একাধিকবার পুনর্গঠিত হয় এবং পরে আবার খেলাপি হলেও তিনি কখনো খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হন না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনাকাঠামো নিয়ন্ত্রণ

ব্যাংকিং খাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রভাবের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমকে নানাভাবে প্রভাবিত করা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে।

আমলানির্ভর পরিচালনা পর্ষদ : আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে একজনের বেশি সরকারি কর্মকর্তা রাখা হয় না। কোনো কোনো দেশে তাদের উপস্থিতি থাকলেও পর্ষদে তাদের ভোটাধিকার রাখা হয় না। আইনে উল্লেখ করা যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে খাতসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের পর্ষদ সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশগুলো যথা নেপাল[৩০] এবং শ্রীলঙ্কার[৩১] কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্ষদে একজন করে এবং ভারতের[৩২] কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্ষদে দুজন সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান রাখা হলেও বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্ষদে তিনজন সরকারি কর্মকর্তা রাখা হয়েছে এবং এ ছাড়া দুজন সাবেক আমলা এই পর্ষদে রাখা হয়েছে, যা পরিচালনা পর্ষদের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরোপের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

সরকারের পছন্দমাফিক গভর্নর নিয়োগ : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, খাতসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গভর্নর নিয়োগবিষয়ক অনুসন্ধান কমিটি করা হয়। যে কমিটি

গভর্নর নিয়োগ নীতিমালার আলোকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় যোগ্য ও উপযুক্ত গভর্নর পদপ্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করে এবং এর মধ্য থেকে গভর্নর নিয়োগের জন্য সরকারকে সুপারিশ করে। সরকার এই সুপারিশের ভিত্তিতে গভর্নর নিয়োগ করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে গভর্নর নিয়োগে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পছন্দমাফিক এবং সরকারের অনুগত গভর্নর নিয়োগ করা হয়, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ওই গভর্নর সরকারের বিরোধিতা না করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন গভর্নর পদত্যাগের মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে নতুন একজন গভর্নরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। যার ব্যাংকিং বিষয়ে জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে একজন মুখ্য তথ্যদাতা জানান।

পছন্দমাফিক ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ : অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ দিয়ে থাকে। গভর্নরের মতো ডেপুটি গভর্নর নিয়োগেরও সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। তবে ডেপুটি গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি অনুসন্ধান কমিটি করা হয়। এই অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও কিছু অনিয়ম সংঘটিত হয়। একটি কমিটির সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের একজন চেয়ারম্যানকে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ যাকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা হবে সেই নির্ধারণ করে দিচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কে করবে। এই কমিটি কর্তৃক একবার ডেপুটি গভর্নর নিয়োগের যে সুপারিশ করা হয়েছিল, তার মধ্যে দুজনের নামে দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ থাকার কারণে সরকার তা গ্রহণ না করায় পরবর্তী সময়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বয়সসীমা এক মাস বৃদ্ধি করে নতুন একজনকে আবেদন করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয় এবং পরে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীর প্রভাবে ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ করা হয়, যার ফলে ওই শিল্পগ্রুপের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রয়োজনমাফিক দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

তদারকি কার্যক্রমে রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোনো ব্যাংকের অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে গেলে শীর্ষ পর্যায়ের বিভিন্ন মন্ত্রী বা মন্ত্রণালয় থেকে টেলিফোনে চাপ প্রয়োগ করে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে চাপ দেওয়ার জন্য তার পুরোনো কিছু হিসাবের মধ্য থেকে ভুল-ত্রুটি খুঁজে বের করে সামনে নিয়ে আসা হয়। এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার ভয়ে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ঝুঁকি কেউ নিতে চায় না। ব্যাংক উদ্যোক্তাদের অধিকাংশ সরাসরি ক্ষমতাসীন দলের অংশ বা সরকারের ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফলে আইন লঙ্ঘন করলেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে পাঁচটি ব্যাংক পর্ষদ গঠনে অনিয়ম করলেও ব্যাংকগুলোকে ছাড় দেওয়া হয়। এ ছাড়া দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একজন পর্যবেক্ষক দেওয়া হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে তাদের কার্যক্রম শুধু বোর্ড সভায় উপস্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমে অভ্যন্তরীণ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতার ঘাটতির পাশাপাশি তদারকি সক্ষমতার ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি লক্ষ করা যায়, যা ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ব্যবস্থাকে দুর্বল করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বের সক্ষমতায় ঘাটতি : এক দশকে রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন ব্যাংক অনুমোদন, ব্যবসায়ীদের চাপে বারবার ব্যাংকিং নীতি প্রণয়ন বা পরিবর্তন, ব্যাংক পরিচালন ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান না নেওয়া ইত্যাদি ঘটনায় ব্যাংকিং খাতসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব বা প্রেশার গ্রুপের চাপের কাছে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নদের নমনীয়তা লক্ষণীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে দুর্বল নেতৃত্ব ও সদিচ্ছার ঘাটতির কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনগতভাবে প্রাপ্ত ক্ষমতাটুকুও চর্চা করতে পারছে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ করার চেষ্টার নজির লক্ষ করা গেলেও সরকারের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে পদত্যাগের দৃষ্টান্ত বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রয়েছে। এমনকি বাংলাদেশেও ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আগের গভর্নরদের এই ক্ষমতা প্রয়োগের উদাহরণ রয়েছে। সমঝোতার মাধ্যমে অনৈতিক ঋণ দেওয়া-নেওয়ার অভিযোগে ৩৪ জন ব্যাংক পরিচালককে অপসারণ এবং একটি ব্যাংকের পর্ষদ সভায় দুই গ্রুপের সংঘর্ষের কারণে সম্পূর্ণ পর্ষদ বাতিল করা এবং পরবর্তী সময়ে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সুপারিশ করলেও তা গ্রহণ না করা ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক আগে দেখালেও এ ধরনের দৃষ্টান্ত বর্তমানে খুব একটা দেখা যায় না; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের মর্জি মেনে নেওয়া হয়।

জনবলসংকট : বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট ও অনসাইট তদারকি সংশ্লিষ্ট বিভাগে বিদ্যমান প্রথম শ্রেণির শূন্যপদের কারণে সৃষ্ট জনবলসংকট তদারকি কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে এবং অনিয়ম-দুর্নীতি চিহ্নিত করতে বিলম্ব হয়। ব্যাংকিং পরিদর্শন বিভাগে একত্রে (ডিবিআই-১ ও ডিবিআই-২) ৪৫ দশমিক ৭ শতাংশ প্রথম শ্রেণির পদ শূন্য রয়েছে এবং অফসাইট সুপারভিশনে ৩৬ দশমিক ৮ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে।

চিত্র ২ : তদারকি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোয় প্রথম শ্রেণির শূন্যপদ

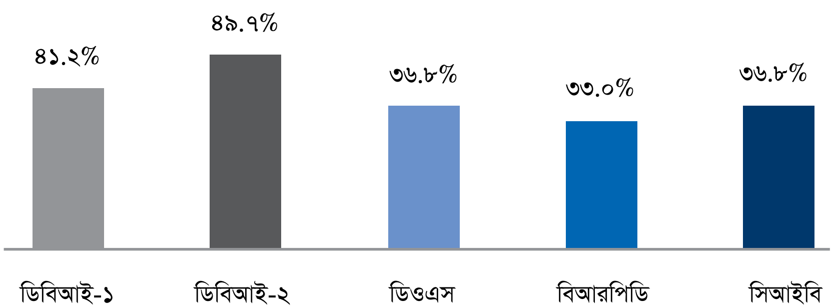

দায়িত্ব-অর্পণের (delegation) ক্ষেত্রে সংকোচনমূলক নীতি : দুই বছর আগেও পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তাদের সরাসরি যেকোনো ব্যাংক পরিদর্শনের ক্ষমতা থাকলেও বর্তমানে ডেপুটি গভর্নরের পূর্বানুমতি ব্যতীত পরিদর্শন করা যায় না।

পরিদর্শন সময়কাল ও পরিদর্শন দলে জনবল ঘাটতি : কোনো ব্যাংকের একটি শাখায় নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য ন্যূনতম ১০-১৫ দিন প্রয়োজন হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন থেকে পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে দু-তিনজনের একটি পরিদর্শন দল একটি শাখার ১০ শতাংশ কার্যক্রমকে নমুনা হিসেবে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ছাড়া অনেক ব্যাংকে পরিদর্শন দলের চাওয়া তথ্য-উপাত্ত প্রদানে ইচ্ছাকৃত বিলম্বের নির্দেশনা থাকার ফলে পরিদর্শনের জন্য এই নির্ধারিত সময়কেও যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় না।

পরিদর্শন দলের ক্ষমতা হ্রাস : আগে পরিদর্শন দল প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারলেও বর্তমানে ডেপুটি গভর্নরের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। উল্লিখিত কারণ পরিদর্শন কার্যক্রমকে মন্থর করে এবং ব্যাংকিং খাতের অনেক অনিয়ম-দুর্নীতি ও জালিয়াতির ঘটনা উদঘাটনে বিলম্ব হয়।

পরিদর্শন সংখ্যা হ্রাস : বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা এবং ব্যাংকগুলোর শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সার্বিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন সংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।* ব্যাংকের শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যাংক পরিদর্শনের সংখ্যা হ্রাস লক্ষণীয়। ব্যাংকের যেসব শাখায় ঋণ ও আমানতের পরিমাণ অধিক সেখানে পরিদর্শন বেশি হয়ে থাকে, ফলে অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত খেলাপিরা যে শাখায় পরিদর্শন কম হয়, সেখান থেকে ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন।

সারণি ৫ : অনসাইট সুপারভিশন কর্তৃক ব্যাংক পরিদর্শন সংখ্যা**

অর্থবছর	শাখার সংখ্যা	বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট পরিদর্শন সংখ্যা***
২০১৪-১৫	৭৬৫১	২৪৯০টি
২০১৫-১৬	৭৯৭১	২৭৮৩টি
২০১৬-১৭	৮২৪২	২৪১৩টি
২০১৭-১৮	৮৬২৯	১৯১৭টি

* রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা

** ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শুধু ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ এবং ২- এর পরিদর্শন সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে। যে বিভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিদর্শন করে থাকে।

*** বিশদ পরিদর্শন, মুখ্য ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন এবং বিশেষ পরিদর্শন

তথ্যের গুণগত মানে সমস্যা : অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক তথ্য গোপন বা ভুল তথ্য পাঠালে তা অফসাইট তদারকির মাধ্যমে ধরা পড়ে না। ফলে অনিয়ম-দুর্নীতি, ঋণ জালিয়াতি চিহ্নিত করতে বিলম্ব হয়।

তথ্য পর্যালোচনায় বিলম্ব : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদের কার্যবিবরণী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাঠানো হলেও জনবলের ঘাটতির কারণে সব ব্যাংকের কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করতে দীর্ঘ সময় লাগে।

প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণে বিলম্ব : আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে অফসাইট ও অনসাইট তদারকি, প্রতিবেদন তৈরি ও চূড়ান্তকরণ এবং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একক বৃহত্তম ঋণসীমা লঙ্ঘনের ঘটনা ২০০৭ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে সংঘটিত হলেও ২০১৬-১৭ সালে এ বিষয়টি ধরা পড়ে। এ ঘটনায় ব্যাংকের ওই শাখার ব্যবস্থাপক প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকলেও পরবর্তী সময়ে তিনি পদোন্নতি পেয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন। ২০২০ সালে এসে ওই জালিয়াতির সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা উদঘাটিত হয় এবং তার অপসারণের সুপারিশ করা হয়।

তদারকি কার্যক্রমে সুশাসন : অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করা : অনেক তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় তদন্ত কার্যক্রম মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অনেক সময় 'আর্থিক খাতের স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে' এই অজুহাতে সংঘটিত অনিয়মের বিষয়গুলো প্রতিবেদনে উল্লেখ না করে অভিযুক্ত ব্যাংকগুলোকে শুধু মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়।

প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ দেওয়া : অনেক ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের দু-একজন কর্মকর্তার সঙ্গে কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠীর যোগসাজশের মাধ্যমে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত অনিয়ম চূড়ান্ত প্রতিবেদন থেকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রতিবেদন গোপন করা : ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া বিভিন্ন ব্যাংকের তদন্ত প্রতিবেদনগুলো পরে আর ব্যবহার করা হয় না। একজন মুখ্য তথ্যদাতা জানান যে 'সেগুলো ব্ল্যাক হোলে হারিয়ে যায়'।

দুর্বল তদন্ত প্রতিবেদন (আন্ডার রিপোর্টিং) করা : তদারকি কাজে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের একাংশ আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধার বিনিময়ে প্রকৃত তথ্য গোপন করে দুর্বল তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে।

দায়িত্ব পালনে অনীহা বা অবহেলা : সরকারের সুদৃষ্টিতে থেকে চাকরির মেয়াদ শেষে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপর্যায়ে নিয়োগের আশায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশ প্রভাবশালীদের অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এ ছাড়া পদোন্নতির জন্য একজন কর্মকর্তার কাজের মূল্যায়নে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক উচ্চ নম্বর পেতে হয়, ফলে তার সুনজরে থাকার জন্য অনৈতিক আরোপিত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে হৃদ্যতা বা স্বজনপ্রীতি : বেসরকারি ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে অনেক ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

আবর্তমান দ্বার (revolving door) উদ্ভূত স্বার্থের দ্বন্দ্ব : বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনেকে অবসরের পরপরই যে প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি করতেন, সেখানে উচ্চপদে যোগদান করে থাকেন। চাকরিকালেই তাদের এ ধরনের প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং তারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে থাকেন।

তদারকি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

তিনভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কিত জবাবদিহি নিশ্চিত হয়–

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ : সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বাইরে খাতসংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধির উপস্থিতি বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি নিশ্চিত করে থাকে;

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে জবাবদিহি : নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে জবাবদিহি অর্থে জনগণের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়; এবং

তথ্যের উন্মুক্ততা : তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে সর্বসাধারণের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত হয়।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের উল্লিখিত তিন ধরনের জবাবদিহি প্রক্রিয়াতেই ঘাটতি লক্ষণীয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত বিদ্যমান রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সীমিত ভূমিকা

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা মূলত প্রশাসনিক (যেমন নতুন বিভাগ অনুমোদন) ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত (বাজেট অনুমোদন) গ্রহণের মধ্যে সীমিত। ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নেওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সৌজন্যতাবশত ও আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে পর্ষদ সভায় অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন, কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের মধ্যে সরকারি প্রতিনিধির সংখ্যা অনেক বেশি (বর্তমান ও সাবেক আমলা মিলিয়ে পাঁচজন) হওয়ার ফলে সরকারের নির্বাহী বিভাগের মতামত বা হস্তক্ষেপের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া বাকি সদস্যও সরকারের পছন্দ মোতাবেক নিযুক্ত হওয়ার ফলে এই পর্ষদ একটি স্বাধীন জবাবদিহিকাঠামোর অংশ হয়ে উঠতে পারেনি। এ ছাড়া সরকার কর্তৃক চারজন মনোনীত সদস্য রাখার কথা থাকলেও বর্তমানে তিনজন রাখা হয়েছে। যার ফলে পর্ষদের ভূমিকা আরও সীমিত হয়েছে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে জবাবদিহিতে ঘাটতি

বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২-এর মাধ্যমে সংসদীয় কমিটির কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে জবাবদিহির বাধ্যবাধকতা প্রদান করা হয়েছে।[৩৩] অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে প্রতিবেদন প্রেরণের বাধ্যবাধকতা বাংলাদেশ ব্যাংকের থাকলেও,

মন্ত্রী-সাংসদসহ বিপুলসংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তি ব্যাংকিং খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে এই জবাবদিহিকাঠামো ততটা কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। বিগত তিনটি সংসদের সংসদীয় কমিটিগুলোতে এক বা একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঋণ বিতরণে অনিয়মের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক চতুর্থ প্রজন্মের একটি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার চার দিনের মধ্যে সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির তৎকালীন সভাপতি মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের নিরীক্ষা বিভাগকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক কর্মকাণ্ডের ওপর একটি বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনার সুপারিশ করে তার ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন করতে বলে। এ ছাড়া একটি কমিটি কর্তৃক একটি বৃহৎ ঋণ কেলেঙ্কারি বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হলেও তা প্রকাশে সভাপতি অনীহা প্রকাশ করেন এবং পরবর্তী সময়ে ওই তদন্ত প্রতিবেদন কমিটির আলোচ্যসূচিতেও রাখা হয়নি।

তথ্যের উন্মুক্ততা

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি প্রণয়নের কারণ ও ব্যাখ্যা প্রকাশে ঘাটতি : বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক, ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে, যেখানে ব্যাংকিং খাতের কিছু সার্বিক চিত্র এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী থাকে। কিন্তু নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, প্রধান প্রধান নীতি গ্রহণের ব্যাখ্যা, নীতি গ্রহণের কারণ, অন্যান্য নীতির ওপর এই সব নীতির সম্ভাব্য প্রভাবের ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভার কার্যবিবরণী, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সভার সদস্যদের ভোট ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রকাশ বা তথ্যের উন্মুক্ততায় যথেষ্ট ঘাটতি লক্ষণীয়। এর ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক সিদ্ধান্ত কিছু ব্যবসায়ী গ্রুপের অনুকূলে যায় এবং আমানতকারীর স্বার্থ পরিপন্থি হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য/গভর্নর/ডেপুটি গভর্নর নিয়োগে স্বচ্ছতার ঘাটতি : বাংলাদেশ ব্যাংকের উচ্চপর্যায়ের (পর্ষদ সদস্য বা গভর্নর) নিয়োগ-প্রক্রিয়া, মেয়াদকাল, পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, দায়িত্বের পরিধি কী হবে ইত্যাদি বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণে পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ইত্যাদি নীতিনির্ধারণী পদগুলোয় নিয়োগের সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত ব্যাখ্যার ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি : সব ধরনের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে তা 'আর্থিক খাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে' নির্বিচারে এই অজুহাত দেখানো হয়। ফলে ঋণখেলাপি ও ব্যাংকের অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রেরিত তিন শ ঋণখেলাপির তালিকা প্রকাশ করা হলেও সেখানে শুধু প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এই তিন শ প্রতিষ্ঠানের তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে একই ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। কিন্তু যেসব ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ গ্রহণ করেছেন, তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। এ ছাড়া যারা একাধিকবার রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ করে পুনরায় ঋণখেলাপি হয়েছেন, তাদের নাম কখনো প্রকাশ করা হয় না। বর্তমান গবেষণার জন্য একাধিকবার লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক সাক্ষাৎকার ও তথ্য প্রদান করেনি। পরবর্তী কালে তথ্য অধিকার

আইনে আবেদন করার পরও তথ্য না দেওয়ায় তথ্য কমিশনে আপিল করা হয়। তারপরও নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আংশিকভাবে তথ্য প্রদান করা হয়।

উপসংহার

এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয় যে, সরকারি নীতি ও কৌশলে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং খাত সংস্কার ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সুশাসনের কথা বলা হলেও এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি রয়েছে। ব্যবসায়ীদের ইচ্ছায় সরকার কর্তৃক তাদের অনুকূলে আইন পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে ব্যবসায়ীদের অবাধ প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে আইনগত বাধা, সচ্ছিার ঘাটতি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এর প্রাপ্ত ক্ষমতা চর্চা করতে না পারা, তদারকি সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি এবং তদারকি কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রমশ অবনমন ঘটেছে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্টদের আজ্ঞাবাহিতে পরিণত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি, সরকারের সদিচ্ছার ঘাটতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপের কারণে ব্যাংকিং খাতে আইনের লঙ্ঘন ও অনিয়ম-দুর্নীতির মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার মাধ্যমে কয়েকটি ব্যবসায়ী গ্রুপ কর্তৃক সমগ্র ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংক থেকে আমানতকারীদের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ হিসেবে নিজেদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের দখলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খেলাপি ঋণ আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণখেলাপিদের অনুকূলে বারবার আইন সংশোধন ও নীতি প্রণয়ন ব্যাংকিং খাতকে ঋণখেলাপিবান্ধব করেছে এবং খেলাপি ঋণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছে, যা নিয়মিত ঋণ গ্রহীতাকে খেলাপি হতে উৎসাহিত করছে। এসব কারণে সৃষ্ট বিপুল পরিমাণে খেলাপি ঋণ ব্যাংকিং খাতে, বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে চরম মূলধন সংকট তৈরি করেছে। এই সংকট কাটাতে প্রতিবছর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে জনগণের করের টাকা থেকে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ কিছু মানুষের অনিয়ম-দুর্নীতির বোঝা ক্রমাগতভাবে জনগণের ওপর চাপানো হচ্ছে। খেলাপি ঋণ অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ ও বিদেশে অর্থ পাচার, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে ব্যাংকিং খাতের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকাকে ব্যাহত করছে।

সুপারিশ

গবেষণার আলোকে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সুস্থ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা কায়েমে নিচের সুপারিশগুলো করা হলো–

সার্বিক

১. ব্যাংকিং খাতসংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ, স্বনামধন্য, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম এমন দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠন করতে হবে। ওই

কমিশন বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংকিং খাত সংস্কারের জন্য একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে, যেখানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আইন সংশোধনসংক্রান্ত

২. ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৪৬ ও ৪৭ ধারা সংশোধন করে বাংলাদেশ ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে।

৩. ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৫৮ ও ৭৭ ধারা সংশোধন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ পালনে একাধিকবার ব্যর্থ বা আমানতকারীদের ক্ষতি করছে এমন ব্যাংককে অধিগ্রহণ, ব্যাংক কোম্পানির ব্যবসা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ এবং ব্যাংক কোম্পানির পুনর্গঠন বা একত্রকরণ করার ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংককে দিতে হবে।

৪. ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর আমানতকারীর স্বার্থ পরিপন্থী ও ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র কায়েমে সহায়ক এমন সব ধারা সংশোধন বা বাতিল করতে হবে; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

- একই পরিবারের একাধিক সদস্য ব্যাংকের পরিচালক হতে পারবে না।
- পরিচালক পদে একাদিক্রমে নয় বছর মেয়াদে নিয়োগের বিদ্যমান বিধান বাতিল করতে হবে। পরিচালক পদের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ তিন বছর এবং মেয়াদ শেষে তিন বছর বিরতি সাপেক্ষে পুনর্নিয়োগ করা যাবে।
- পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা হ্রাস করে ১৩ জন করতে হবে এবং যার এক-তৃতীয়াংশ হবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত আমানতকারীদের প্রতিনিধি।

৫. ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির সংজ্ঞা ও এ ক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

৬. সমগ্র ব্যাংকিং খাত থেকে একক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক গ্রুপের সর্বোচ্চ ঋণসীমা নির্ধারণ করতে হবে।

৭. রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যাংক পরিচালক হওয়া থেকে বিরত রাখার বিধান করতে হবে।

৮. বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার, ১৯৭২-এর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে পরিচালক নিয়োগের বিধান ব্যাংক কোম্পানি আইনের পরিচালক নিয়োগের বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগসংক্রান্ত

৯. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ ও অপসারণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লিখিত নীতিমালা তৈরি করতে হবে, যেখানে অনুসন্ধান কমিটির গঠন, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট পদগুলোয় নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকবে।

১০. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে তিনজন সরকারি কর্মকর্তার স্থলে বেসরকারি প্রতিনিধির (সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ যেমন আর্থিক খাত ও সুশাসনবিষয়ক) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসহ সব ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে একটি প্যানেল তৈরি করে সেখান থেকে বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগের বিধান করতে হবে।

প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন ও ব্যাংকিং নীতি সংশোধনসংক্রান্ত

১২. আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশপ্রাপ্ত খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশনিং রাখার প্রবিধান প্রণয়ন করতে হবে।

১৩. ব্যাংক পরিচালকদের ঋণ সর্বদা বাংলাদেশ ব্যাংকের যথাযথ নজরদারির মাধ্যমে অনুমোদনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৪. আমানতকারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এমন সব নীতি ও প্রবিধান (ঋণ শ্রেণীকরণ, অবলোপন, পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন ইত্যাদি) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসরণ করে সংশোধন করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি-সংক্রান্ত

১৫. সংসদের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত অর্থবিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে।

১৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত সিদ্ধান্ত, এর ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্ষদের ভোট সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

১৭. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করতে হবে এবং তার ওপর ভিত্তি করে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৮. বারবার ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন করে খেলাপি হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি-সংক্রান্ত

১৯. ব্যাংক পরিদর্শনের সংখ্যা ও সময়কাল বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভাগগুলোর শূন্য পদগুলো পূরণ করতে হবে।

২০. ব্যাংক পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিদর্শনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা পরিদর্শন দলকে দিতে হবে।

২১. পরিদর্শন প্রতিবেদন যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত ও এর সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে।

২২. তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি ও বাস্তবায়নে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২, ধারা ৭এ (এফ)।

[২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৫/১৬-২০১৯/২০, পৃষ্ঠা-১৪১-১৬৫। https://plandiv.gov.bd/site/files/d40d434b-5afa-48ec-854b-6ce391c466d6/

[৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১, ২০১২। http://plancomm.portal.gov.bd/

[৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ, ২০১৭। http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/3acbc97e_6ba3_467b_bdb2_cfb3cbbf059f/SDGs%20Bangla%20Book_Final.pdf

[৫] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯-১০। https://www.bb.org.bd/pub/index.php (১৫ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত)

[৬] বাংলাদেশ ব্যাংক, ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২০১৯। https://www.bb.org.bd/pub/index.php (১৫ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত)

[৭] দ্য ডেইলি স্টার, 'ব্যাড লোনস্ টোয়াইস এস লার্জ', ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯। https://www.thedailystar.net/frontpage/default-loan-in-bangladesh-is-more-than-double-reports-imf-1805437 (২০ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে সংগৃহীত)

[৮] ড. মইনুল ইসলাম, 'ব্যাংকিং খাত নিয়ে উল্টাপাল্টা পদক্ষেপ বন্ধ করুন : ব্যাংকিং সংস্কার কমিশন গঠন করুন', ১২ অক্টোবর ২০১৯। [সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) কর্তৃক জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে অনুষ্ঠেয় ব্যাংকিং খাত পরিচালনাসংক্রান্ত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত 'মূল প্রবন্ধ']

[৯] বাংলাদেশ ব্যাংক, ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট-সংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা, বিআরপিডি সার্কুলার নং-৫, ১৬ মে ২০১৯।

[১০] বাংলাদেশ ব্যাংক, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ) ২০২০। https://www.bb.org.bd/pub/index.php (১৫ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত)

[১১] দৈনিক প্রথম আলো, 'শীর্ষে অগ্রণী, এবি, ন্যাশনাল ও প্রিমিয়ার', ২৫ আগস্ট, ২০২০। http://tiny.cc/n7nzsz (২৫ আগস্ট, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত)

[১২] দৈনিক কালেরকণ্ঠ, 'মূলধন ঘাটতি পূরণে অর্থ পেল না রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক', ২ জুলাই, ২০১৯। https://www.kalerkantho.com/print-edition/industry-business/2019/07/02/786376 (৫ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত)

[১৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৭২, ধারা ১০(৩) ও (৪), ১৫(১), ৯(৩) এবং ৭৭(১)।

[১৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৭২, ধারা ৯(২)।

[১৫] ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১, ধারা ৪৬(১) ও (৬), ৫৮ এবং ৭৭।

[১৬] বাংলাদেশ ব্যাংক, ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২০১৯। https://www.bb.org.bd/pub/index.php (১৫ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত)|

[১৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ ধারা ১৫ (১০), ১৫কক(১)।

[১৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ ধারা ১৫ এবং ১৫ কক।

[১৯] বাংলাদেশ ব্যাংক, ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন পরিশোধ নীতিমালা, বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৫, ১৬ মে, ২০১৯।

[২০] বাংলাদেশ ব্যাংক, ঋণ অবলোপনের নীতিমালা, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১, ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

[২১] বাংলাদেশ ব্যাংক, ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং নীতিমালা, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৩, ২১ এপ্রিল, ২০১৯।

[২২] দৈনিক সমকাল, 'এখনো সীমার বেশি এডিআর ১৯ ব্যাংকে', ১৩ জুন, ২০১৯। http://tiny.cc/jakzsz (২৬ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত)

[২৩] বাংলা ট্রিবিউন, 'নির্বাচনের বছরেও সুদহার এক অঙ্কে নামছে না', ৪ জুন, ২০১৮। www.banglatribune.com/business/news/330721/

[২৪] বাংলাদেশ ব্যাংক, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৫, ১০ মে, ২০২০ ও এসএমইএসপিডি সার্কুলার লেটার নং- ০৩, ১২ মে, ২০২০।

[২৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১, ধারা ১৪ ক(১)।

[২৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১, ধারা ১৫ (১)।

[২৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১, ধারা ১৫(৬)(অ)।

[২৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সংসদ বুলেটিন (২২ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ বুধবার অনুষ্ঠিতব্য সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তরদানের প্রশ্ন ও উত্তর), তারকা চিহ্নিত প্রশ্নত্তোর- ৪৭১, পৃষ্ঠা নং- ০৮-১১।

[২৯] বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ-১১ https://www.bb.org.bd/pub/index.php (১৫ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত)

[৩০] নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক, নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক অ্যাক্ট, ২০০২। https://www.nrb.org.np/category/acts/?department=lgd (১৫ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত)

[৩১] সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলঙ্কা, মানিটারি ল অ্যাক্ট, ২০১৪। https://www.cbsl.gov.lk/en/laws/acts/legislative-enactments (১৫ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত)

[৩২] রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৪, রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া। https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/RBIA1934170510.PDF (১৫ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত)

[৩৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২, ধারা ৩৮এ।

সংসদীয় আসনভিত্তিক থোক বরাদ্দ : অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ*

জুলিয়েট রোজেটি

গবেষণার প্রেক্ষাপট

সাংবিধানিকভাবে সংসদ সদস্যের দায়িত্ব সংসদে আইন প্রণয়ন করা, নিজ নিজ এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এর বাইরেও সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায়, ফলে সাধারণ মানুষের কাছে একটি প্রত্যাশা তৈরি হয় যে সাংসদরা নির্বাচিত হয়ে এলাকার রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি নির্মাণ করার ব্যবস্থা করবেন (টিআইবি ২০১২)। অন্যদিকে, নির্বাচনী এলাকার জনগণ সাংসদদের স্থানীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণের ভূমিকায় দেখতে চায় কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের হস্তক্ষেপ চায় না (টিআইবি ২০০৮)। জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ ও উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ সালে সংশোধিত)-এর মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের সরাসরি জবাবদিহি করার কোনো আইনি বা পদ্ধতিগত ব্যবস্থা (সংসদ সদস্যের জন্য আচরণবিধি, সংসদ সদস্যের সম্পৃক্ততায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য এলাকাভিত্তিক গণশুনানি ইত্যাদি) নেই।

স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রথম ২০০৫-০৬ অর্থবছরে সরকার ও বিরোধী উভয় দলের সংসদ সদস্যদের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রত্যেক সদস্যের অনুকূলে দুই কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। পরবর্তী সময়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় (একনেক) এই প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ক্রমান্বয়ে আসনপ্রতি এই থোক বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। একনেক সভায় ৩০০টি আসনের জন্য ৪ হাজার ৮৯২ কোটি টাকার 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন (এক)' (আইআরআইডিপি ১) শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন করা হয় ২০১০ সালে। প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ২০১৫ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৮৪টি (সিটি করপোরেশন এলাকা সংশ্লিষ্ট ১৬টি আসন ছাড়া) আসনের জন্য ৬ হাজার ৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আইআরআইডিপি ২ প্রস্তাব উত্থাপন ও অনুমোদন করা হয়।

---

* ২০২০ সালের ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের কাজ চলাকালে (২০২১ সাল পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি) জুন ২০২০ সালে তৃতীয় পর্যায়ে ২৮০টি (সিটি করপোরেশন এলাকা সংশ্লিষ্ট ২০টি আসন ছাড়া) আসনের জন্য ৬ হাজার ৪৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে আইআরআইডিপি ৩ প্রস্তাব উত্থাপন ও অনুমোদন করা হয়েছে।

সংরক্ষিত আসনের ৫০ জন নারী সদস্য এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত নন। সংসদীয় আসনপ্রতি থোক বরাদ্দের আওতাভুক্ত পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য- গ্রামীণ সড়কব্যবস্থার উন্নয়ন, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ এবং গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন; কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান এবং কৃষি-অকৃষি পণ্যের বিপণন সুবিধা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করা। এসব প্রকল্পের প্রস্তাবনায় গ্রামীণ সড়কব্যবস্থার উন্নয়ন, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ এবং গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন সম্পর্কিত স্কিম থাকলেও অন্যান্য লক্ষ্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত কোনো ধরনের স্কিম পাওয়া যায়নি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ নির্বাচন ও বাস্তবায়ন হওয়ার কারণে স্কিমের সম্ভাব্যতা যাচাই, কারিগরি ও আর্থিক বিশ্লেষণের সুযোগের অনুপস্থিতি বিদ্যমান এবং বাস্তবায়নের সময় অর্থ অপচয়ের ঝুঁকিসহ কাজের স্থায়িত্বশীলতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যে পল্লি এলাকার উন্নয়নের জন্য এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের প্রতিবেদনও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় এবং মাঠপর্যায়ে দুটি প্রকল্পের কিছু স্কিমের সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) প্রতিবেদনে স্কিম বাস্তবায়নের কাজে চ্যালেঞ্জ ও অনিয়ম তুলে ধরা হয়েছে। তবে আইএমইডি ২০১০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত কোনো প্রকল্পেরই পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করেনি।

ইতিপূর্বে জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। টিআইবির নিয়মিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে প্রতি সংসদ সদস্যের অনুকূলে পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ থোক বরাদ্দ প্রকল্পের নীতিমালা ও কৌশল এবং পদ্ধতিগত কাঠামো, স্কিম পরিকল্পনায় এলাকার চাহিদা নিরূপণ ও গৃহীত স্কিমগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ, স্কিম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও চ্যালেঞ্জ, বাস্তবায়িত স্কিমের কাজের মান ও বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও সংঘটনসহ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্র কেমন বা কী অবস্থায় রয়েছে, তার উত্তর খোঁজার উদ্দেশ্যে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংসদীয় আসনে থোক বরাদ্দের আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের স্কিমসমূহের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো–

- এই প্রকল্পের আইনি ও পদ্ধতিগত কাঠামো পর্যালোচনা করা;
- স্কিম পরিকল্পনায় এলাকার চাহিদা নিরূপণ ও স্কিমের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ পর্যলোচনা করা;
- স্কিমসমূহের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা এবং বিভিন্ন ধাপে চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা;
- স্কিম বাস্তবায়নে দুর্নীতি হয়েছে কি না এবং হলে তার ধরন ও মাত্রা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা; এবং
- গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

এই গবেষণায় মিশ্র পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যেখানে পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পদ্ধতিগত স্তরভিত্তিক দৈবচয়ন ব্যবহার করে সার্বিকভাবে নমুনায়ন করা হয়েছে। গবেষণায় আইআরআইডিপি শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন স্কিমগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশের ৩০০টি সংসদীয় আসন থেকে পদ্ধতিগত দৈবচয়নের ভিত্তিতে মোট ৫০টি আসন নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি আসনের একাধিক উপজেলা থেকে একটি উপজেলাকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিটি উপজেলায় ওই প্রকল্পের আওতাধীন বাস্তবায়িত স্কিমের তালিকা থেকে আইআরআইডিপি-১-এর ১০টি করে মোট ৫০০টি এবং ও আইআরআইডিপি-২-এর ৩টি করে মোট ১৫০টি স্কিম পদ্ধতিগত দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন এবং এই ৬৫০টি স্কিমের ওপর তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়। তবে আইআরআইডিপি-১-এর ৩১টি স্কিম নথিতে যে উপজেলার আওতায় রয়েছে মাঠপর্যায়ে সেগুলো অন্য উপজেলার আওতাভুক্ত থাকায় এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য ৫টি স্কিম পর্যবেক্ষণ করা যায়নি। অন্যদিকে নমুনায়িত এলাকায় কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আইআরআইডিপি-২-এ অতিরিক্ত ১৪টি স্কিম অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে মোট ৬২৮টি (আইআরআইডিপি-১-এ ৪৬৪টি ও আইআরআইডিপি-২-এ ১৬৪টি) স্কিম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সারণি ১ : তথ্যের ধরন, উৎস ও সংগ্রহপদ্ধতি

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি	তথ্যদাতা/ উৎস	টুলস্
প্রত্যক্ষ তথ্য	নমুনায়িত আসন ও এলাকার সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত স্কিম পর্যবেক্ষণ	আইআরআইডিপি-১-এর ৪৬৪টি ও আইআরআইডিপি-২-এর ১৬৪টি মোট ৬২৮টি স্কিম পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট
	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (৩৪১টি)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ঠিকাদার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, স্থানীয়	চেকলিস্ট
		সরকার বিশেষজ্ঞ, সংসদ সদস্য, সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির সভাপতি বা সদস্য, গণমাধ্যমকর্মী	
	দলীয় আলোচনা (১৮০টি)	এলাকার জনগণ (কৃষক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, অন্যান্য পেশাজীবী)	চেকলিস্ট
	সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন স্কিম সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যের জন্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন)	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান	চেকলিস্ট
পরোক্ষ তথ্য	নথি পর্যালোচনা	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি বা প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি	-

২০১৯ সালের মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ এবং ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক ও বিশ্লেষণকাঠামো

এই গবেষণায় সুশাসনের নির্দেশকের মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ ও শুদ্ধাচার চর্চার আওতায় নিচের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই গবেষণার সব তথ্য ও ফলাফল গবেষণাসংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

সারণি ২ : সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণকাঠামো

নির্দেশক	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়
আইনি সক্ষমতা	• প্রকল্প সম্পর্কিত আইন, নীতিমালা, কৌশল ও কাঠামো।
স্বচ্ছতা	• স্কিমগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের তথ্য এবং আর্থিক হিসাবের উন্মুক্ততা। • স্কিমগুলোর দরপত্র বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা।
জবাবদিহি	• স্কিমগুলোর কাজের মান (কাজ চলাকালে পণ্যের ব্যবহার, কাজ শেষে স্কিমের মান ও স্থায়িত্ব) পরিবীক্ষণ। • স্কিমসংশ্লিষ্ট অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিস্পত্তি পদ্ধতি । • প্রকল্পের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
অংশগ্রহণ	• স্কিম তালিকাভুক্তিকরণে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের চাহিদা ও মতামত গ্রহণ। • স্কিমগুলোর উপযোগিতা যাচাইয়ে জনমতামতের প্রতিফলন।
দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ	• স্কিম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা। • দুর্নীতি প্রতিরোধব্যবস্থা।

গবেষণার ফলাফল

নমুনায়িত স্কিমগুলোর পরিচিতি

উভয়ে প্রকল্পের নমুনায়িত স্কিমগুলোর মধ্যে রাস্তার স্কিম সর্বোচ্চ যথাক্রমে ৬০ থেকে ৬২ শতাংশ। আইআরআইডিপি ২ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন থাকায় কাজ সম্পন্ন হওয়া স্কিমের মধ্য থেকে নমুনা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে; ফলে ধরন অনুযায়ী স্কিমের হারের ক্ষেত্রে আইআরআইডিপি-১ প্রকল্পের সঙ্গে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। স্কিমের কাজ শিডিউলে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, যার সার্বিক হার ৬৮ শতাংশ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হওয়া স্কিমগুলোর মধ্যে আইআরআইডিপি ১-এ ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ ও আইআরআইডিপি ২-এ ৮৫ দশমিক ২ শতাংশ স্কিমে অতিরিক্ত এক বছর সময় লেগেছে। কাজ শেষ হতে দেরি হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে জমি না ছেড়ে কাজে বাধা দেওয়া, দুর্গম এলাকায় নির্ধারিত সময়ে এলজিইডি প্রতিনিধির কাজ বুঝিয়ে দিতে দেরি হওয়া, সামগ্রী পরিবহনে দেরি, সামগ্রী ও যন্ত্র যেমন পাথর বা রোলার পেতে দেরি হওয়া, নির্মাণসামগ্রীর দাম হঠাৎ বৃদ্ধি ও পণ্যসংকট, সাইট থেকে পণ্য চুরি, বিল পেতে দেরি হওয়া এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

চিত্র ১ : আইআরআইডিপি ১-এর নমুনা স্কিমগুলোর ধরন (%)

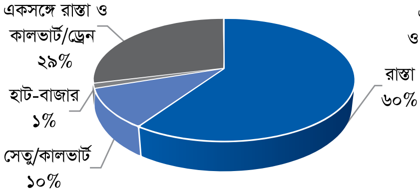

চিত্র ২ : আইআরআইডিপি ২-এর নমুনা স্কিমগুলোর ধরন (%)

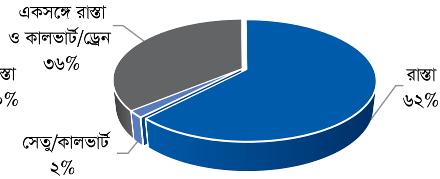

আইনি সক্ষমতা

পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যের আসনপ্রতি থোক বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইনিকাঠামোর অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা ও নির্দেশিকা না থাকলেও গত দুটি সংসদ ধরে এই বরাদ্দ সরাসরি অনুমোদনের মাধ্যমে এটি একটি চর্চায় পরিণত হয়েছে। ফলে স্কিম নির্বাচন-প্রক্রিয়া, এলাকার চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ বণ্টনের পূর্বশর্ত নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় কার্যকারিতার ঘাটতি লক্ষণীয়। সর্বোপরি, সংসদ সদস্যের জন্য আচরণবিধি ও সদস্য থাকাকালে তাদের সম্পদসহ কর্মকাণ্ডের বিবরণ প্রকাশের আইনি বা পদ্ধতিগত ব্যবস্থা না থাকায় জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

সারণি ৩ : আইনি সক্ষমতা ও চ্যালেঞ্জ

আইনি সক্ষমতা	চ্যালেঞ্জ
• সব উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের অভিন্ন নীতিমালা থাকলেও সংসদীয় আসনের থোক বরাদ্দ প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, নির্দেশিকা নেই।	• স্কিম তালিকাভুক্তিকরণে জন-অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া, এলাকা ও চাহিদাভেদে বরাদ্দ বণ্টনের পূর্বশর্ত নির্ধারিত নয়। • প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি।
• নির্বাচনের আগে সংসদ সদস্যদের আয়-ব্যয়, হালনাগাদ সম্পদ বিবরণীসহ আটটি তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার বিধান (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪কক)।	• নির্বাচন-পরবর্তী হালনাগাদ তথ্য উন্মুক্ত করার আইনিকাঠামো এবং তাদের কর্মকাণ্ড, সততা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি না থাকায় জনপ্রতিনিধির জবাবদিহির ঘাটতি।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

আইনি সক্ষমতা	চ্যালেঞ্জ
• স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও সুযোগ রয়েছে [জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ ও উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ সালে সংশোধিত)]।	• রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের সুযোগের প্রসার এবং স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ব্যাহত।
• সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী মাঠপর্যায়ে টেন্ডার-প্রক্রিয়া ও স্কিম বাস্তবায়ন।	• বাস্তবে অকার্যকর তদারকি ব্যবস্থার কারণে মাঠপর্যায়ে নিয়মানুয়ায়ী স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি।
• স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান নীতিকাঠামোতে পেশাজীবী ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ছাড়া এলাকার সাধারণ নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব - নগর সমন্বয় কমিটিতে প্রায় ২৯ শতাংশ এবং ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটিতে প্রায় ১৪ শতাংশ।	• এলাকার সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় তাদের মতামতের প্রতিফলনের ঘাটতি।

স্বচ্ছতা

তথ্যের উন্মুক্ততা : কম বাজেটের বরাদ্দে স্কিম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের বোর্ডের জন্য কোনো পৃথক খাত না থাকার অজুহাতে ঠিকাদাররা তথ্য বোর্ড টানান না। নমুনায়িত স্কিমগুলোর কাজ চলাকালে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনো তথ্য বোর্ড ছিল না। প্রকল্পের নীতিমালা ও নির্দেশিকাসহ স্কিম বাস্তবায়ন অগ্রগতি, আর্থিক হিসাব, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি উন্মুক্ত করার জন্য কোনো ওয়েবসাইট বা প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম নেই।

কার্যাদেশ বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা : কোনো কোনো এলাকায় সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের কাছে বছরে ২০-২৫ শতাংশ কাজ বিক্রি (অবৈধভাবে সাব-কন্ট্রাক্ট) হয় কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক নথিতে সাব-কন্ট্রাক্টের কোনো প্রমাণ রাখা হয় না। তদারকি প্রতিষ্ঠানও এ বিষয়টি সম্পর্কে জানে। বাস্তবে তারা দরপত্রপ্রাপ্ত প্রকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মাঠপর্যায়ের যেকোনো পরামর্শ বা পর্যবেক্ষণ অবহিত করেন এবং তাদের নামে বিল দেওয়া হয়।

জবাবদিহি

বাস্তবায়িত স্কিমের মান : মাঠ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সার্বিকভাবে ৭৭ দশমিক ৮ শতাংশ সম্পূর্ণ এবং ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ স্কিমে আংশিক কাজ হলেও ৪ দশমিক ৪ শতাংশ স্কিমের কোনো কাজ হয়নি। কাজ হয়নি এমন স্কিমের মধ্যে রাস্তার স্কিম ১৮টি, ব্রিজ বা কালভার্ট স্কিম ১টি এবং রাস্তা ও কালভার্ট বা ড্রেন স্কিম ৭টি। যেসব স্কিমের সম্পূর্ণ ও আংশিক কাজ হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ৩৩ শতাংশ স্কিমের কাজের মান ভালো ছিল না।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন : উপজেলা এলজিইডির দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্য-সহকারীরা স্কিমের কাজ চলাকালে মাঠপর্যায়ে তদারকি করে থাকেন। মাঝে মাঝে উপজেলা/জেলা থেকে অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও যান (বিস্তারিত সারণি ৪)। সার্বিকভাবে ৭৬ দশমিক ২ শতাংশ স্কিমে কাজ চলাকালে তদারকি হয়েছে। তদারকির সময় এলজিইডির প্রতিনিধিরা ওয়ার্ক অর্ডার বইয়ে কাজের সম্পর্কে তাদের পর্যবেক্ষণ, মতামত এখানে লিখে রাখবেন এবং পরে সেই অনুযায়ী কাজ হয়েছে কি না, তা পরবর্তী তদারকি দল বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসে দেখবেন। কাজ শেষে এ বইটি এলজিইডি কার্যালয়ে সংরক্ষণের জন্য জমা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।

সারণি ৪ : কাজ চলাকালে স্কিম তদারককারীদের ধরন (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)

তদারককারীদের ধরন	স্কিমের শতকরা হার
এলজিইডির প্রকৌশলী	৭০.০
ওয়ার্ক অ্যাসিসট্যান্ট/ কার্য-সহকারী	১৭.১
ইউপি/উপজেলা/পৌর চেয়ারম্যান, ইউপি মেম্বার, ওয়ার্ড কমিশনার	১৩.১
পরিচয় জানা যায়নি	১২.০

তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়ন ও মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা : কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনে এবং জামানতের অর্থপ্রাপ্তির জন্য ঠিকাদার কাজ সম্পন্ন হওয়ার এক বছর পর আবেদন করলে সেখানেও স্কিমের তৎকালীন অবস্থা কেমন আছে এটা লিখে যথাক্রমে বিলের অর্থ ও জামানত ছাড় দেওয়া হয়। বাস্তবে মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে নথিতে লিখিত বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষণের অসামঞ্জস্য পাওয়া যায় (বিস্তারিত সারণি ৫)।

সারণি ৫ : প্রতিবেদনে 'কাজের মান সন্তোষজনক' উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত অবস্থা (স্কিমের শতকরা হার)

স্কিমের প্রকৃত অবস্থা	কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ 'কাজের মান সন্তোষজনক' (n = ৪০৪)	জামানতপ্রাপ্তির অনুমোদন প্রতিবেদনে উল্লেখ 'কাজের মান সন্তোষজনক' (n = ৪১৫)
সম্পূর্ণ কাজ হয়েছে	৭৪.০	৭৬.১
আংশিক কাজ হয়েছে	২১.৫	১৯.৩
কোনো কাজ হয়নি	**৪.৫**	**৪.৬**

স্কিম বাস্তবায়নকালীন কাজের মান এবং এলজিইডির কাজ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণের সঙ্গেও অসামঞ্জস্য দেখা যায়। কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদন এবং কাজ সমাপ্ত হওয়ার এক বছর পর জামানতের টাকা উত্তোলনের আবেদনপত্রে কাজের মান সন্তোষজনক উল্লেখ থাকলেও একটি উল্লেখযোগ্য হারের স্কিমের কাজের মান ভালো ছিল না (বিস্তারিত সারণি ৬)।

সারণি ৬ : প্রতিবেদনে 'কাজের মান সন্তোষজনক' উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে কাজের মান (স্কিমের শতকরা হার)

কাজের মান	কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ 'কাজের মান সন্তোষজনক' (n = ৪০২)	জামানতপ্রাপ্তির অনুমোদন প্রতিবেদনে উল্লেখ 'কাজের মান সন্তোষজনক' (n = ৪১৩)
ভালো	৪১.৮	৪১.৬
মোটামুটি	২৮.৬	২৭.৪
ভালো নয়	**২৯.৬**	**৩১.০**

সার্বিকভাবে ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ স্কিম সংস্কার করা হয়েছে (আইআরআইডিপি ১-এর ১৮ দশমিক ৩ শতাংশ এবং আইআরআইডিপি-২-এর ৩ দশমিক ৭ শতাংশ)। যেসব স্কিম এখনো সংস্কার হয়নি, সেখানে একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক (৪২ দশমিক ২ শতাংশ) স্কিমের অবস্থা ভালো নয়, সংস্কার প্রয়োজন। আইআরআইডিপি-২-এর স্কিমগুলো অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক (১৭ দশমিক ৪ শতাংশ) স্কিমের অবস্থা ভালো নয়, সংস্কার প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত নতুন স্কিমগুলোর এই অবস্থার কারণ, ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাবে তদারকি ব্যবস্থার কার্যকারিতা ব্যাহত, মানসম্মত নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার না করার প্রবণতা, এলাকার ও স্কিমের অবস্থান বিবেচনায় না নিয়ে রাস্তার নকশা করার চর্চা, পাইলিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ না রাখা এবং রাস্তায় নিয়মবহির্ভূতভাবে থ্রি-হুইলারসহ ভারী মালবাহী ট্রাক চলাচল।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নব্যবস্থার অকার্যকারিতার কারণ

রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা : ঠিকাদাররা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা তার দলের কর্মী/পরিচিত/আত্মীয় হলে কাজ চলাকালে কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে তদারকির ঘাটতি দেখা যায়। ঠিকাদারের থেকে কমিশন/লভ্যাংশপ্রাপ্তি এবং দলীয় নেতা-কর্মী/আত্মীয়-পরিচিত যারা ঠিকাদার তাদের মাধ্যমে ভোটের সময় ও ক্ষমতাসীন থাকাকালে এলাকার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ফলে সংসদ সদস্যের একাংশ কর্তৃক তদারকির ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

অংশীজনদের পারস্পরিক সমঝোতা : আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ঠিকাদার অর্থের বিনিময়ে নিম্নমানের কাজ করে লাভবান হন এবং বাস্তবায়নকারী ও তদারকি কর্তৃপক্ষ নিয়মবহির্ভূত আর্থিক

লেনদেনের বিনিময়ে কাজের অনুমোদন দেন এবং জনপ্রতিনিধি, দলীয় ব্যক্তি ক্ষমতার প্রভাব ও আর্থিক লাভ বজায় রাখেন। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধাপে নির্দিষ্ট হারে কমিশন-বাণিজ্য, রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের চাঁদাবাজি মূলত অংশীজনদের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধার সমঝোতা সম্পর্কের (Win Win Situation) প্রতিফলন।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সদিচ্ছার ঘাটতি : ঠিকাদারদের কাজে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ওয়ার্ক অর্ডার বইয়ে তদারকি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লিখিত পর্যবেক্ষণ, মতামত অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে তদারকি পদ্ধতি থাকলেও এই লিখিত পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং ঠিকাদারদের মধ্যে কার্যকর উদ্যোগ ও আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। একটি উপজেলায় একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্পের অনেকগুলো স্কিমের কাজ চলাকালে সব স্কিমে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তদারকির ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দুর্গম এলাকা, বিশেষ করে পার্বত্য ও চর এলাকায় নিয়মিত তদারকি করতে যাওয়ার ক্ষেত্রে যানবাহন সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরিকল্পনা কমিশনের আইএমইডির (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ) থেকে এই উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করা হয়নি। রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত বলে এই প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ঘাটতি দেখা যায়।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি : এসব স্কিমের কাজের মান নিয়ে এলজিইডির জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে এলাকার জনগণ, সাংবাদিক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে মৌখিক অভিযোগ আসে, লিখিত অভিযোগ করার প্রবণতা দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এলাকার সংসদ সদস্যের কাছে সরাসরি অভিযোগ করা হয়, তখন সংসদ সদস্য জেলা/উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অভিযোগ পাওয়া গেলে তার বিস্তারিত জানার জন্য টিম গঠন করে প্রকৌশলীসহ মাঠ সহকারীরা সেখানে পরিদর্শনে যান, ঠিকাদার কেন কাজ করছেন না, সেটা জানার জন্য ঠিকাদারের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। মাঠপর্যায়ে দেখা যায়, স্কিম বাস্তবায়নকালে কাজের মান সম্পর্কে অভিযোগ থাকলেও ৭৭ দশমিক ৬ শতাংশ ক্ষেত্রে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়নি। এর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে অভিযোগ দিলে তার নিষ্পত্তি না হওয়া, প্রতিবাদ বা সরাসরি অভিযোগ করলে হুমকি ও হয়রানির সম্মুখীন হওয়া এবং ঠিকাদার সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের আত্মীয়/পরিচিত/দলীয় কর্মী হলে ভয়ে কোনো অভিযোগ করতে আগ্রহী না হওয়া।

সার্বিকভাবে কাজ চলাকালে কাজের মান সম্পর্কে ১৮ দশমিক ৮ শতাংশ স্কিমে অভিযোগ জানানো হয়। সার্বিকভাবে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে এলাকাবাসী এলজিইডি প্রকৌশলী/ কার্য-সহকারীর কাছে, ৩ দশমিক ৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যকে অভিযোগ জানিয়েছেন। এ ছাড়া ঠিকাদার, ইউপি/উপজেলা/পৌর চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড কমিশনার ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি/ এলাকার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের এলাকাবাসী অভিযোগ জানিয়েছেন।

তবে এই অভিযোগের ভিত্তিতে ৭৬ দশমিক ১ শতাংশ স্কিমের ক্ষেত্রে কাজের মানের কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখা যায়নি। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির কার্যকারিতার ঘাটতির কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে এলাকাবাসীর অভিযোগ অনেক ক্ষেত্রে তদারকি প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি বা রাজনৈতিক প্রভাবশালী কর্তৃক আমলে না নেওয়া, ঠিকাদারের সঙ্গে এলজিইডি, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের মধ্যে আর্থিক যোগসূত্র, প্রতি স্কিমে নির্দিষ্ট হারে কমিশন-বাণিজ্য; ফলে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ সম্পন্ন করলেও ঠিকাদার জবাবদিহির বাইরে থাকেন।

অংশগ্রহণ

নমুনায়িত ৫০টি নির্বাচনী আসনে সার্বিকভাবে ৩৪ শতাংশ স্কিমের ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে চাহিদা/মতামত নেওয়া হয়েছে। এই ৫০টির মধ্যে ২৯টি নির্বাচনী আসনের মোট স্কিমের ২৮ দশমিক ৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য এলাকা পরিদর্শনের সময়ে সরাসরি এলাকাবাসীর চাহিদা/ মতামত নিয়েছেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কমিটিতে এলাকার সাধারণ জনগণের তুলনামূলক কম প্রতিনিধিত্ব এবং কমিটিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চার কারণে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণসহ তাদের মতামত দেওয়ার সুযোগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের মতে, সার্বিকভাবে এলাকার জন্য স্কিম উপযোগী বিবেচিত হয়েছে। তবে এলাকার প্রভাবশালী/ দলীয় ব্যক্তিদের বিশেষ অনুরোধ, সংসদ সদস্য বা তাদের আত্মীয়দের বাড়িসংলগ্ন উপজেলা/ ইউনিয়নের গুরুত্ব বিবেচনা ইত্যাদি কারণে ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও কিছু স্কিমের তালিকাভুক্তি হয়েছে। এ ছাড়া, পরিকল্পনার আগে জনগণের চাহিদা/ মতামতের ভিত্তিতে উপযোগিতা যাচাই না করার ফলে কাঁচাবাজারসংলগ্ন, জলাবদ্ধ বা বন্যাপ্রবণ এলাকায় রাস্তা কংক্রিট ঢালাই না করা, সংযোগ সড়কহীন সেতু, পার্বত্য এলাকাসহ নদীভাঙনপ্রবণ অঞ্চলেও একই বরাদ্দ ইত্যাদি বিষয় এখনো বিদ্যমান।

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ

দুর্নীতির মাত্রা : স্কিমের দরপত্র পাওয়া থেকে পুরো কাজ শেষ করে চূড়ান্ত বিল ও জামানতের টাকা উত্তোলন পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন অংশীজনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হারে (কখনো কখনো এককালীন) নিয়মবহির্ভূত কমিশন-বাণিজ্য বিদ্যমান। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে দরপত্র-প্রক্রিয়া প্রবর্তন হলেও তদারকি প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার, সংসদ সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অনিয়ম রয়েছে। আইনি প্রতিবন্ধকতা, মিথ্যা মামলার ভয় ও হয়রানির আশঙ্কায় অনিয়মের তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ ও আগ্রহের ঘাটতিসহ প্রতিবাদ ও অভিযোগ না করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

সারণি ৭ : স্কিম বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে আর্থিক অনিয়মের চিত্র

পর্যায়/ ব্যক্তি	নিয়মবহির্ভূত কমিশনের শতকরা হার (স্কিমপ্রতি প্রকৃত বরাদ্দের ভিত্তিতে)	নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) - ধরনভেদে
টেন্ডার পাওয়ার পর কার্যাদেশ প্রদানকারী (ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু) কমিটি	১%	-
ছয় ধাপে পণ্য টেস্ট (যাচাই)	-	৬-৮ হাজার টাকা x ৬ ধাপ = ৩৬ - ৪৮ হাজার টাকা (স্কিমপ্রতি টেস্টের ফি ব্যতীত)
উপজেলা এলজিইডি কার্যালয়ের পিয়ন	-	৫০০ - ১০০০ টাকা (স্কিমপ্রতি)
ফিল্ড ওয়ার্ক অ্যাসিসট্যান্ট (তদারকি)	১% - ২%	-
উপজেলা এলজিইডির উপসহকারী প্রকৌশলী	১%	-
উপজেলা এলজিইডির সহকারী প্রকৌশলী	১% -২%	-
জেলা এলজিইডি কার্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগ	২% - ২.৫%	-
নির্বাহী প্রকৌশলী	০.২৫%	-
ট্রেজারি (বিল ছাড় করাতে)	০.৫% - ২%	-
হিসাবরক্ষক (জামানতের টাকা উত্তোলন)	১%	-
ট্রেজারির পিয়ন	-	২০০-৫০০ টাকা (স্কিমপ্রতি)
প্রকল্প পরিচালক	০.৫% - ১%	
এলাকার রাজনৈতিক প্রভাবশালী কর্মী বাহিনী/ চাঁদাবাজ	-	৫-১০ হাজার টাকা (স্কিমপ্রতি)
এলজিইডি'র নিরীক্ষার সময়	-	২-৫ লাখ টাকা (ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকাদার থেকে বার্ষিক এককালীন)
মোট (নিরীক্ষাকালীন কমিশনের হার ছাড়া)	**৮.২৫% - ১২.৭৫% (স্কিমপ্রতি)**	**৪১,৭০০ - ৫৯,৫০০ টাকা (স্কিমপ্রতি)**

সূত্র : স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদার, সংবাদকর্মী ও অন্যান্য অংশীজনের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে।

সারণি ৮ : মোট ৬২৮টি স্কিমের প্রকৃত বিলের পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক দুর্নীতির প্রাক্কলিত* মূল্য (টাকায়)

(অডিট ও সংসদ সদস্যের জন্য কমিশনের হার ছাড়া)

মাত্রা	স্কিমপ্রতি প্রাক্কলন	মোট প্রাক্কলন
সর্বনিম্ন	৪,৩৩,২৩৭	২৭,২০,৭৩,০৮০
সর্বোচ্চ	৬,৬৪,৬০৩	৪১,৭৩,৭০,৮৩৩

* কমিশনের শতকরা হার এবং ধরনভেদে অর্থের পরিমাণ উভয় তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিকভাবে আর্থিক দুর্নীতির মূল্য প্রাক্কলন করা হয়েছে

অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন

রাজনৈতিক প্রভাব : কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের সুপারিশে এলজিইডির মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে পছন্দের ঠিকাদারদের দরপত্র বাছাই করা হয়। সঠিক নিয়মে কাজপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 'বিড মানি' দিয়ে পছন্দের ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হয়। ঠিকাদারের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির মাধ্যমে/দলের তহবিলে গ্রহণ করা হয়। ঠিকাদারি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের একাংশ এলাকার উন্নয়নকাজের বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ ও চাঁদাবাজির সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ফলে ঠিকাদার ক্ষমতাসীন দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অর্থ দিয়ে সমঝোতা করতে বাধ্য হন। রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোতে থাকার কারণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা (ইউপি চেয়ারম্যান/ মেম্বার, পৌর মেয়র/ কাউন্সিলর/কমিশনার ইত্যাদি) মাঠপর্যায়ে ঠিকাদার হিসেবে কাজ করার সময় তাদের একাংশের মধ্যে মানসম্মত কাজ না করার প্রবণতা দেখা যায়।

রাস্তা তৈরির সামগ্রী (ইট, রড, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি) ব্যবসার সঙ্গে জড়িত স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের একাংশ থেকে নির্মাণসামগ্রী ক্রয়ে ঠিকাদারদের বাধ্য করা হয় এবং ক্রয় না করলে কাজে বাধা প্রয়োগসহ ভয়ভীতি দেখানো হয়। ফলে ঠিকাদাররা নিম্নমানের ও পরিমাণে কম উপকরণ নিয়ে বাধ্য হয়ে সমঝোতা করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিকাদার পূর্ণাঙ্গ কাজ ও মানসম্মত কাজ না করে বিল উত্তোলনের জন্য রাজনৈতিক প্রভাবশালী, জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে তদবির করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে কাজ সম্পন্ন হওয়ার অনুমোদনসহ বিলের অর্থছাড় করাতে বাধ্য করা হয়।

প্রভাবশালী সিন্ডিকেট : কিছু ক্ষেত্রে কয়েকজন ঠিকাদার একত্র হয়ে অন্যান্য দরপত্রের মতো একই মূল্যের দরপত্র অনলাইনের মাধ্যমে পূরণ করেন এবং দরপত্র পাওয়ার পর পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে প্রাপ্ত কাজের বণ্টন করে নেন। অনেক ক্ষেত্রে একটা লভ্যাংশের (৫-১০ শতাংশ) ভিত্তিতে ওই এলাকার প্রভাবশালী ঠিকাদারদের কাছে প্রাপ্ত কাজ বিক্রি করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেও এই সমঝোতার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার : কাজ পাওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে নতুন ও কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদার তুলনামূলক বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের লাইসেন্স ব্যবহার করে টেন্ডার জমা দেন। এ ক্ষেত্রে সম্পর্ক ও মৌখিক চুক্তির ওপর নির্ভর করে পারস্পরিক লেনদেনের বিষয়টি নির্ধারিত হয়।

ট্যাক্স ফাঁকি : পার্বত্য এলাকায় আদিবাসী ঠিকাদারদের ভ্যাট দিতে হয় না, ফলে ওই এলাকার বাঙালি ঠিকাদারদের মধ্যে ভ্যাট ফাঁকি দেওয়ার জন্য আদিবাসী ঠিকাদারদের লাইসেন্স ব্যবহার করে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যায়। উল্লেখ্য, খুব কমসংখ্যক (২০-৩০ শতাংশ) আদিবাসী ঠিকাদার নিজেরা সরাসরি কাজ করেন।

মানসম্মত সামগ্রী ব্যবহার না করা : ঠিকাদার তার লাভ বেশি করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মানসম্মত নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করেন না (ইট ও বালুর মান খারাপ দেওয়া, মানসম্মত রড ব্যবহার না করা, বিটুমিনের সঙ্গে পোড়া মবিল মিশিয়ে ঢালাই দেওয়া, ব্রিজে কংক্রিটের ঢালাইয়ের পরিবর্তে ইটের গাঁথুনি দিয়ে পিলার করা) এবং পরিমাণের থেকে কম সামগ্রী ব্যবহার (রাস্তায় পিচের লেয়ারের পরিমাণ কম দেওয়া, পরিমাণে কম রডের ব্যবহার করা) করেন।

আঞ্চলিক গোষ্ঠীর প্রভাব : পার্বত্য এলাকায় বিশেষ আঞ্চলিক ক্ষমতাশালী সিন্ডিকেট (জনসংহতি সমিতি-জেএসএস, ইউপিডিএফ, জেএসএস সংস্কার, ইউপিডিএফ সংস্কার ইত্যাদি) ক্ষমতাবলে সব উন্নয়নকাজের একটি অংশ (৫-১০ শতাংশ) ঠিকাদারদের থেকে আদায় করে থাকে। এই কমিশন না দিয়ে কোনো ঠিকাদার কাজ করতে পারেন না।

পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে সংসদ সদস্যের ভূমিকা

স্কিম তালিকা প্রণয়ন : স্কিমগুলোর অগ্রাধিকার তালিকা পরিকল্পনার আগে এলাকা সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যেমন, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, উপজেলা চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কমিশনার ও তার দলীয় লোকদের মাধ্যমে এলাকার চাহিদা সম্পর্কে জানেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কমিটিতে জনগণের অংশগ্রহণসহ তাদের মতামত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না।

দরপত্র প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ততা : কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য তার ক্ষমতাবলে সরাসরি বিভিন্ন স্কিমের কাজ তার পরিবারের সদস্য, আত্মীয় ও দলের কর্মী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৮৬ শতাংশ আসনে সরাসরি দলীয় তহবিলে (এককালীন) অথবা সংসদ সদস্যের একাংশ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে সহকারীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট হারে (১-২ শতাংশ) ঠিকাদারের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, এলাকা ও ঠিকাদারের সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের সম্পর্কভেদে সরাসরি দলীয় তহবিলে (এককালীন) অনুদানের পরিমাণের বিভিন্নতা রয়েছে; যার সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি।

সারণি ৯ : নির্দিষ্ট হারে (প্রতি স্কিমে ১-২ শতাংশ) কমিশনের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যের একাংশ কর্তৃক (ব্যক্তিগত সহকারীর মাধ্যমে) আর্থিক দুর্নীতির প্রাক্কলিত মূল্য (টাকায়)

মাত্রা	স্কিমপ্রতি প্রাক্কলন (টাকায়) (প্রকৃত বিলের গড় পরিমাণের ভিত্তিতে)	আইআরআইডিপি-১ প্রকল্পে আসনপ্রতি প্রাক্কলন (টাকায়) (১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের ভিত্তিতে)	আইআরআইডিপি-২ প্রকল্পে আসনপ্রতি প্রাক্কলন (টাকায়) (২০ কোটি টাকা বরাদ্দের ভিত্তিতে)
সর্বনিম্ন	৪৭,৪৫৯	১৫,০০,০০০	২০,০০,০০০
সর্বোচ্চ	৯৪,৯১৮	৩০,০০,০০০	৪০,০০,০০০

সূত্র : স্থানীয় ঠিকাদার, সংবাদকর্মী ও অন্যান্য অংশীজনের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে। *সব সংসদ সদস্যের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়।*

স্কিম বাস্তবায়নকালে তদারকি : কাজ চলাকালে নমুনা স্কিমে মাঠপর্যায়ে গিয়ে সংসদ সদস্যের সরাসরি তদারকি দেখা যায়নি। কোনো কোনো এলাকায় সংসদ সদস্য স্বপ্রণোদিত হয়ে এলাকায় থাকাকালে স্কিম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে অথবা ফোন করে খোঁজখবর নেন, অভিযোগ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেন। স্কিম বাস্তবায়নকালে কাজ সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো কোনো সংসদ সদস্য নিজে এসে কাজ বন্ধ করে দেন এবং কাজের মান ভালো করার জন্য কঠোর নির্দেশনা দেন। কোথাও কোথাও দলীয় নেতা-কর্মী/আত্মীয়-পরিচিত ঠিকাদার হিসেবে কাজ করলে সংসদ সদস্যরা কাজের মান বা অগ্রগতি নিয়ে অভিযোগ এলেও তার সমাধান করতে এবং তাদের জবাবদিহি করতে আগ্রহী হন না। কারণ পারস্পরিক সুবিধা সম্পর্কে উভয়েই আর্থিকভাবে লাভবান হন এবং এরা দলের হয়ে ভোটের সময় এবং সংসদ সদস্য ক্ষমতাসীন থাকাকালে এলাকার নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করেন।

বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যের সম্পৃক্ততা : এলাকায় প্রকল্পের স্কিম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ওই আসনে নির্বাচিত প্রধান বিরোধী বা অন্য বিরোধী দলের সংসদ সদস্যকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসেবে এলাকায় বা ক্ষমতাসীন দলের কাছে তিনি কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিবেচিত হয়। ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব বিবেচনায় রেখে সমঝোতার ভিত্তিতে বিরোধী দলের সদস্য এলাকায় স্কিম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পান। কোনো কোনো সংসদ সদস্য স্কিম তালিকা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন তদারকি প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা বজায় রেখে সম্পৃক্ত থাকতে চেষ্টা করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সংসদ সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের জন্য আর্থিক সুবিধাসহ বিভিন্ন অনিয়মকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, যা পুরো উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশে (প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৩টি) সংসদীয় আসনের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যপ্রতি থোক বরাদ্দ প্রকল্পের দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিভিন্ন দেশে প্রকল্পের কাঠামোসহ বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া এখনো বিবর্তনশীল। উল্লেখ্য, এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে

ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের পর্যবেক্ষণ রয়েছে। আটটি দেশের (ভারত, ভুটান, কেনিয়া, ঘানা, উগান্ডা, জ্যামাইকা, পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন আইল্যান্ড) প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এসব দেশে আইনি/নীতিকাঠামো, বরাদ্দের হার/পরিমাণ, বরাদ্দের প্রক্রিয়া, পরিচালনাকাঠামো, তদারকি কাঠামো, তথ্যের উন্মুক্ততা ইত্যাদি নির্দেশকের আলোকে বিভিন্ন ধরনের চর্চা বিদ্যমান।

এ দেশগুলোর দৃষ্টান্তের আলোকে বাংলাদেশে যেসব ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে সংসদীয় আসনপ্রতি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা, বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের তহবিলে বরাদ্দ দেওয়া (সংসদ সদস্যের সরাসরি এই অর্থ ব্যয় করার সুযোগ থাকে না) এবং প্রকল্পের স্কিম বাস্তবায়ন ও মাঠপর্যায়ে তদারকি করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ। তবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি চর্চায় এই দেশগুলোর দৃষ্টান্ত বিবেচনায় বাংলাদেশে এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতিগত ঘাটতি দেখা যায়, তার মধ্যে রয়েছে সুনির্দিষ্ট আইনি/নীতিকাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা ও নির্দেশনা না থাকা, কমিউনিটি স্তরে কোনো পরিচালনা/পরিবীক্ষণ কমিটি এবং নীতিকাঠামো পর্যবেক্ষণ ও সার্বিক মূল্যায়ন নিরীক্ষণের জন্য পৃথক কোনো সংসদীয় কমিটি না থাকা, জনগণের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য প্রকাশ না করা (এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পৃথক কোনো ওয়েবসাইট নেই বা প্রকল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটেও বিস্তারিত তথ্য উন্মুক্ত নয়) এবং আইএমইডি কর্তৃক এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের ঘাটতি।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

এই প্রকল্পের কয়েকটি লক্ষ্য থাকলেও কেবল অবকাঠামো উন্নয়ন স্কিম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়িত হয়েছে। স্কিম তালিকাভুক্তিসহ এলাকাভেদে স্কিমের উপযোগিতা যাচাইয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের সরাসরি মতামত দেওয়ার সুযোগের ঘাটতি রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে অধিকাংশ স্কিমের উপযোগিতা থাকলেও স্কিম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পারস্পরিক সুবিধার সমঝোতা সম্পর্ক এবং কমিশন-বাণিজ্যের ফলে স্কিমের কাজের মান প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়।

সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্য কাজের অগ্রগতি তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করলেও সদস্যদের একাংশ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন অনিয়মকে প্রশ্রয় দেন। ফলে সার্বিকভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ। সুনির্দিষ্ট নীতিকাঠামো/ কৌশলের ঘাটতিসহ আসনভিত্তিক স্কিম সম্পর্কিত তথ্যসহ প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুপস্থিত। সার্বিকভাবে তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি রয়েছে।

এই প্রকল্প সংসদ সদস্যের একাংশের জন্য স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার চর্চা, নির্বাচনে ভোট নিশ্চিত করার চেষ্টা ও অনৈতিকভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সর্বোপরি কার্যকর তদারকি, প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়ন এবং সংসদ সদস্যের সততা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আচরণবিধির অনুপস্থিতি অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে আরও উৎসাহিত করছে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হচ্ছে।

সুপারিশ

১. ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত সংসদীয় আসনে থোক বরাদ্দের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর পৃথকভাবে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করে এগুলোর দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ করতে হবে ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির সুযোগগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করতে হবে এবং এই তথ্য পরবর্তী প্রকল্প পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে হবে।

২. এ প্রকল্পের আইনিকাঠামো বা নীতিমালা সুনির্দিষ্ট করতে হবে, যেখানে স্কিম নির্বাচন-প্রক্রিয়া, ভৌগোলিক অবস্থান ও উপযোগিতা অনুযায়ী স্কিমের নকশাসহ এলাকা ও চাহিদাভেদে বরাদ্দ বণ্টনের পূর্বশর্ত এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নির্দেশনা থাকবে।

৩. প্রকল্পের অধীনে স্কিম পরিকল্পনা ও তালিকাভুক্ত করার আগে সংশ্লিষ্ট আসনের ভৌগোলিক অবস্থান এবং উপযোগিতা অনুযায়ী তার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।

৪. স্কিম তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ ও মতামত নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কমিটিতে স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস করতে হবে।

৫. স্কিম এলাকায় কাজ চলাকালে তথ্যবোর্ড স্থাপন করতে হবে, যেখানে স্কিমের বিবরণ, বাজেট, সময়সীমা, প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের নাম ও যোগাযোগের নম্বর ইত্যাদি থাকতে হবে।

৬. এই প্রকল্পের সব ধরনের তথ্য (নীতিমালা, আসনভিত্তিক স্কিমের তালিকা, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রতিবেদন, বাজেট, স্কিম বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরণ) একটি পৃথক ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৭. কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানসহ বিপণন সুবিধা বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যের সঙ্গে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্কিম পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. জনপ্রতিনিধিদের রাজনৈতিক শুদ্ধাচার চর্চার পাশাপাশি দুর্নীতির প্রবণতা ও সুযোগ হ্রাস করার জন্য কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থা (জনপ্রতিনিধিদের আচরণবিধি, তাদের কর্মকাণ্ডসহ আর্থিক হিসাবের বিবরণ উন্মুক্তকরণ, তাদের সম্পৃক্ততায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য এলাকাভিত্তিক গণশুনানি ইত্যাদি) প্রবর্তন করতে হবে।

৯. স্কিম বাস্তবায়নকালে স্থানীয় উপকারভোগীদের সমন্বয়ে ধারাবাহিকভাবে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা (কমিউনিটি মনিটরিং) প্রবর্তন করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

আকরাম, শাহজাদা মোহাম্মদ; শারমীন, নাহিদ, ‘স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর : সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়’, টিআইবি, ঢাকা, ২০১৩।

আকরাম, শাহজাদা মোহাম্মদ; ‘নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা’, টিআইবি, ঢাকা, ২০১২।

আকরাম, শাহজাদা মোহাম্মদ; আক্তার, তাসলিমা, ‘সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি : অষ্টম সংসদের অভিজ্ঞতা’, টিআইবি, ঢাকা, ২০০৯।

আকরাম, শাহজাদা মোহাম্মদ; দাস, সাধন কুমার ও মাহমুদ, তানভির, ‘জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা : জনগণের প্রত্যাশা’, টিআইবি, ঢাকা, ২০০৮।

‘অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’ প্রস্তাবনা (২০১০-১৫) (২০১৫-১৮)।

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত), মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, মে ২০১৯।

‘*নির্বাচনের বছরে ইচ্ছাপূরণ প্রকল্প*’, দৈনিক প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৮।

‘*সাংসদদের জন্য নির্বাচনী প্রকল্প*’, দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১৭।

মন্ডল, আব্দুল লতিফ, ‘স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করতে অনীহা কেন?’, দৈনিক যুগান্তর, সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৭।

https://lgd.gov.bd/site/page/e1618dfe-ab22-4cb1-ae45-baf9d3444be1

https://www.mplads.gov.in/mplads/Default.aspx

https://en.wikipedia.org/wiki/Constituency_Development_Fund.

https://allafrica.com/stories/201304081752.html

https://www.tisa.or.ke/index.php/about

https://www.ngcdf.go.ke/index.php/about-ng-cdf

সরকারি ক্রয়ে সুশাসন : বাংলাদেশে ই-জিপির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ*

শাহজাদা এম আকরাম, নাহিদ শারমীন ও মো. শহিদুল ইসলাম

গবেষণার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের 'সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬' অনুযায়ী ক্রয় বলতে বোঝায় কোনো চুক্তির অধীন পণ্য সংগ্রহ বা ভাড়া করা বা সংগ্রহ ও ভাড়ার মাধ্যমে পণ্য আহরণ এবং কার্য বা সেবা সম্পাদন করা।[১] একই আইন অনুযায়ী সরকারি ক্রয় বলতে বোঝায় ওই আইনের অধীন সরকারি তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক ক্রয়।[২]

বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ে দুর্নীতি[৩] একটি প্রধান সমস্যা এবং প্রধান 'আলোচিত বিষয়'। ক্রয় কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্যে দরপত্র শিডিউল জমা দিতে বাধা, ক্রয় নিয়ন্ত্রণের জন্য সিন্ডিকেট গঠন, দরপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য সন্ত্রাসী বাহিনীর ব্যবহার, দ্বিগুণ দামে নিম্নমানের জিনিস ক্রয়, ক্রয় প্রস্তাবে বেশি দাম দেখানো, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা দপ্তরের কর্মকর্তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর ফলে সরকারি ক্রয় জনস্বার্থকেন্দ্রিক না হয়ে ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। তবে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম দূর করে সরকারি ক্রয়কে আরও জবাবদিহির মধ্যে আনার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।[৪] এর ধারাবাহিকতায় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (সংক্ষেপে ই-জিপি) প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার পেছনে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ক্রয়পদ্ধতি ক্রয় কার্যক্রমকে দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক করবে বলে ধারণা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

ই-প্রকিউরমেন্টের মূল বিষয় হচ্ছে ব্যবসা থেকে ব্যবসা, ব্যবসায়ের মাধ্যমে ভোক্তা বা ব্যবসা থেকে সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ, কাজ ও পরিষেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা। ২০০০ সালে ই-প্রকিউরমেন্টের ধারণা প্রথম ব্যবহার করে মার্কিন প্রতিষ্ঠান আইবিএম। মেক্সিকোয় অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম ল্যাপটপ উৎপাদনকারী প্ল্যান্টের জটিল ক্রয়পদ্ধতি সহজ করার জন্য আইবিএম এই ব্যবস্থা তৈরি করে। এই ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার তিন বছর পরে সংস্থাটি জার্মানিতে এটি ব্যবহার করে এবং পরে বিশ্বের অন্যান্য সংস্থার কাছে লাইসেন্স ব্যবহার করে বিক্রি করে। পরে ২০০৪ সালে একটি নির্দেশনার মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ে ই-প্রকিউরমেন্ট প্রথম প্রবর্তন করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ২০১৪ সালে এই নির্দেশনা সংশোধনের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছ ও সমান সুযোগের একটি কাঠামো তৈরি করা হয়, যার মধ্যে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা, ক্রয়

---

* ২০২০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

প্রক্রিয়ার মানদণ্ড ঠিক করা, ইলেকট্রনিক দরপত্র দাখিল প্রক্রিয়া, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবেও সরকারি খাতে ই-প্রকিউরমেন্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ইইউর পাশাপাশি যেসব দেশে ই-প্রকিউরমেন্ট চালু হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, মঙ্গোলিয়া, ইউক্রেন, ভারত, সিঙ্গাপুর, এস্তোনিয়া, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া।[৫]

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে যৌথভাবে বাস্তবায়িত 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট টু' (২০০৮-২০১৬)-এর অন্যতম উপাদান হিসেবে ই-জিপি প্রবর্তিত হয়। ২০২১ সালের মধ্যে সব সরকারি পরিষেবা ডিজিটাল করার সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১১ সালের ২ জুন থেকে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে 'সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট' (সিপিটিইউ) ই-জিপি পোর্টাল চালু করে। একই সঙ্গে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ (ধারা ৬৫) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ (বিধি-১২৮) অনুসারে 'বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) গাইডলাইন ২০১১' প্রণয়ন করা হয়।

প্রাথমিকভাবে চারটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ই-জিপি বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ (সওজ), পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)। বর্তমানে ই-জিপি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রকল্প (ডিআইএমএপিপিপি) ডিজিটালকরণ চলমান, যা বাস্তবায়নের সময় ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত। সব প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি ব্যবস্থাপনা করছে সিপিটিইউ। বর্তমানে ই-জিপিতে ৪৭টি মন্ত্রণালয়, ২৭টি বিভাগ, ১ হাজার ৩৪৪টি সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান এবং ৭৭ হাজার ১০১টি দরপত্রদাতা নিবন্ধিত রয়েছে।[৬] ই-জিপিকে সহজ করার জন্য সিপিটিইউর উদ্যোগে ই-জিপির ওপর প্রায় ১৬ হাজার বিভিন্ন অংশীজনকে (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ঠিকাদার) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী সরকারি খাতে ক্রয় দুর্নীতির অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত। সরকারি ক্রয়ে ঘুষ ও দুর্নীতির কারণে বিশ্বব্যাপী বছরে কমপক্ষে ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়; এর ফলে প্রাক্কলিত অর্থনৈতিক ক্ষতি বার্ষিক জিডিপির ১ দশমিক ৫ শতাংশের বেশি।[৭] বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় বাংলাদেশেও সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[৮] বিভিন্ন সরকারি খাত (যেমন বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, স্বাস্থ্য, জলবায়ু অর্থায়ন) ও প্রতিষ্ঠানের (যেমন বাংলাদেশ বিমান, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড) ওপর টিআইবির গবেষণায় ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্নীতির বিভিন্ন ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে। এসব গবেষণায়ও ক্রয়-প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির ফলে বাজেটের একটি বড় অংশের ক্ষতি (৮ দশমিক ৫ থেকে ২৭ শতাংশ) পরিলক্ষিত হয়েছে, যা এই প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নির্দেশ করে।[৯] তবে এসব গবেষণার মূল আলোচনার বিষয় ক্রয় ছিল না বলে সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নিয়ে বিস্তারিত ও গভীর আলোচনার ঘাটতি ছিল।

অন্যদিকে ই-জিপি প্রবর্তনের পরে সরকারি ক্রয়ে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে, সে বিষয়েও কয়েকটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশে ই-জিপির ব্যবহার নিয়ে সম্পন্ন বেশির ভাগ গবেষণায় ই-জিপি ব্যবহারের ইতিবাচক প্রভাব, ক্রয়-প্রক্রিয়ার প্রবণতা ও জনগণের তদারকির প্রভাব আলোচিত। বিশ্বব্যাংকের (২০২০) সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় বাংলাদেশে সরকারি ক্রয়ের সার্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় আইনি, নীতিগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক, ব্যবস্থাপনাকাঠামো ও সক্ষমতা, ক্রয়ের কার্য পরিচালনা ও বাজারব্যবস্থা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সার্বিকভাবে সরকারি ক্রয়ের অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে।[১০] অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায়, একই ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে গতানুগতিক ক্রয়-প্রক্রিয়ার তুলনায় ই-জিপি ব্যবহারের ফলে ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে এবং ই-জিপি ব্যবহারের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল স্থানীয় পর্যায়ে ও বেশি দরদাতার অংশগ্রহণের ফলে ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে (আবদাল্লা ২০১৫)।[১১] হোসেন ও অন্যান্য (২০১৬) আরেকটি গবেষণায় এলজিইডির দ্বারা বাস্তবায়িত কাজের ওপর স্থানীয় নাগরিকদের তদারকি কতটুকু ও কীভাবে কাজ করে তা দেখিয়েছেন।[১২] এ ছাড়া হাসান ও অন্যান্যের (২০১৬) গবেষণায় ই-জিপি প্রয়োগের কিছু বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে।[১৩]

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি ২০৩০) বলা হয়েছে, 'জাতীয় নীতি ও অগ্রাধিকার অনুসারে টেকসইযোগ্য সরকারি ক্রয়কে উৎসাহিত করতে হবে' (লক্ষ্য ১২ দশমিক ৭)।[১৪] জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য স্বচ্ছতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নৈর্ব্যক্তিক শর্তবিশিষ্ট সরকারি ক্রয়কাঠামো প্রবর্তন করবে।[১৫] এ ধরনের কাঠামোতে ক্রয়ের পদ্ধতি, দরদাতাদের পূর্বশর্ত এবং পণ্যের ক্রয়ের কার্যাদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে হবে, যেন দরদাতারা দরপত্র দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় সময় পায়। দাখিলকৃত দরপত্রের যাচাই-বাছাইয়ের পূর্বশর্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। এ ছাড়া গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপনের কাঠামো থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে আপিলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সবশেষে সরকারি ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন বিষয়, যেমন স্বার্থের দ্বন্দ্বসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ, যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষণ চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি থাকতে হবে। জাতিসংঘ ও কনভেনশনের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে উপরিউক্ত শর্ত পূরণে বাংলাদেশও অঙ্গীকারবদ্ধ।

ই-জিপি প্রবর্তনের প্রায় এক দশক পর বাংলাদেশে এর প্রয়োগ ও কার্যকারিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কোন মাত্রায় ই-জিপির চর্চা করছে, সরকারি ক্রয়ের ধরন ও প্রকৃতি বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না, সব সরকারি প্রতিষ্ঠান সব ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি ব্যবহার করে কি না, ই-জিপি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী, ই-জিপি প্রবর্তন করার ফলে সুশাসনের ক্ষেত্রে কোনো গুণগত পার্থক্য বা উন্নতি হয়েছে কি না, এর ফলে দুর্নীতি বা অনিয়ম কমেছে কি না এবং প্রাপ্ত পণ্য, সম্পাদিত কাজ বা গৃহীত সেবার মানের কোনো উন্নতি হয়েছে কি না, ইত্যাদি বিষয় জানার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে ই-জিপির ব্যবহার নিয়ে সম্পন্ন বেশির ভাগ গবেষণায় ই-জিপি ব্যবহারের ইতিবাচক প্রভাব, ক্রয়-প্রক্রিয়ার প্রবণতা ও জনগণের তদারকির প্রভাব আলোচিত হলেও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপির মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তার ওপর বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সরকারি ক্রয় খাতে সুশাসনের আঙ্গিকে ই-জিপির প্রয়োগ ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা। গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্রয় আইন ও বিধি অনুযায়ী ই-জিপি কতটুকু অনুসরণ করা হয় তা চিহ্নিত করা;
- ই-জিপি যথাযথভাবে অনুসরণ না হলে তার কারণ অনুসন্ধান করা;
- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপির কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা; এবং
- ই-জিপির প্রয়োগে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা।

গবেষণাপদ্ধতি

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ই-জিপি বাস্তবায়নকারী প্রথম দিকের প্রতিষ্ঠান হিসেবে চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে– এলজিইডি, সওজ, পাউবো ও আরইবি। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ চারটি প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ ছিল এডিপির প্রায় ২০ শতাংশ।

গবেষণায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'ট্রাফিক সিগন্যাল পদ্ধতি' ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, ই-জিপি প্রক্রিয়া, ই-জিপি ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং কার্যকারিতা– এই পাঁচটি ক্ষেত্রের অধীনে ২০টি নির্দেশকের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি ক্রয় আইন কতটুকু পালন করা হয় তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি নির্দেশককে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন স্কোর দিয়ে তাদের অবস্থান বোঝানো হয়েছে, যা তিনটি রঙের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে প্রতিটি নির্দেশকের স্কোর দেওয়া ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ১ : গবেষণায় ব্যবহৃত স্কোরের মান

উচ্চ স্কোর	২	সবুজ
মধ্যম স্কোর	১	হলুদ
নিম্ন স্কোর	০	লাল

সারণি ২ : একনজরে ক্ষেত্র ও নির্দেশক

ক্ষেত্র	নির্দেশক	
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	১. আর্থিক সক্ষমতা ২. ভৌত সক্ষমতা ৩. কারিগরি সক্ষমতা ৪. মানবসম্পদ	৫. ই-জিপির ব্যবহার ৬. বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ৭. ক্রয় সীমা
ই-জিপি প্রক্রিয়া	৮. ই-জিপিতে নিবন্ধন ৯. টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া ১০. প্রাক-টেন্ডার মিটিং	১১. ই-বিজ্ঞাপন ১২. দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ১৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ই-জিপি ব্যবস্থাপনা	১৪. ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	১৫. কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি	১৬. অভিযোগ নিষ্পত্তি ১৭. নিরীক্ষা	১৮. কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ
কার্যকারিতা	১৯. অনিয়ম ও দুর্নীতি	২০. কাজের মান

স্কোরিং পদ্ধতি

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটি ক্ষেত্রের মোট স্কোর পাওয়ার জন্য ওই ক্ষেত্রের সবগুলো নির্দেশকের স্কোর প্রথমে যোগ করা হয়েছে। এরপর ওই ক্ষেত্রে যতগুলো নির্দেশক রয়েছে তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে এর শতকরা হার বের করা হয়েছে। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রের (প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা) নির্দেশকগুলোর মোট স্কোর ৮ (দুটি নির্দেশক ২ করে, চারটি নির্দেশক ১ করে এবং একটি নির্দেশক ০ পেয়েছে)। এই ক্ষেত্রের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোর ১৪ (৭টি নির্দেশক X প্রতিটি নির্দেশকের সর্বোচ্চ স্কোর ২ ধরে)। কাজেই প্রথম ক্ষেত্রের চূড়ান্ত স্কোর ৮/১৪ X ১০০ = ৬০%। কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক স্কোর পাওয়ার জন্য সবগুলো নির্দেশকের মোট সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত মোট স্কোরের শতাংশ হিসাব করা হয়েছে। যেমন কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মোট স্কোর ১৭ হলে মোট স্কোর হবে ১৭/৪০ X ১০০ = ৪২%।

সবশেষে সার্বিক স্কোরকে কয়েকটি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের স্কোর অনুযায়ী গ্রেড দেওয়া হয়েছে। স্কোরের গ্রেডগুলো হচ্ছে ‘ভালো’ (৮১ শতাংশ বা তার বেশি), ‘সন্তোষজনক’ (৬১ থেকে ৮০ শতাংশ), ‘ঘাটতিপূর্ণ’ (৪১ থেকে ৬০ শতাংশ) এবং ‘উদ্বেগজনক’ (৪০ শতাংশ বা তার নিচে)।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও সময়

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বনিম্ন যে পর্যন্ত ক্রয় করার অনুমোদন রয়েছে, সেই পর্যায় পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সুবিধাজনক নমুনায়নের মাধ্যমে সারা দেশে চারটি প্রশাসনিক বিভাগের একটি করে জেলা এবং ওই জেলার একটি উপজেলা পর্যায়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবস্থিত কার্যালয় ও ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এভাবে চারটি প্রতিষ্ঠানের মোট ৫২টি কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার ও দলগত আলোচনা ব্যবহার করা হয়েছে এবং তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ক্রয় বিশেষজ্ঞ, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঠিকাদার, সংবাদমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও নিবিড় সাক্ষাৎকার (মোট ১৭৭ জনের) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর দলগত আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া পরোক্ষ উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ, প্রাতিষ্ঠানিক বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০১৯-এর জুলাই থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ই-জিপির প্রেক্ষাপট ও কাঠামো

সরকারি ক্রয় আমাদের দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি বড় অংশই সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে সাধিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের (২০১৮-১৯ অর্থবছর) আকার ছিল প্রায় ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে সরকারি ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল প্রায় ২৪ দশমিক ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সরকারি ক্রয়ের পরিমাণ দেশের জিডিপির প্রায় ৮ শতাংশ এবং জাতীয় বাজেটের প্রায় ৪৫ দশমিক ২ শতাংশ।[১৬] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) প্রায় ৮০-৮৫ শতাংশই ব্যয় করা হয় ক্রয়ের জন্য। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সরকারি ক্রয়ের বার্ষিক পরিমাণ ছিল প্রায় ১ হাজার ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার।[১৭] এই হিসাবে ক্রয়ের জন্য প্রতিবছরই ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ছে (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারি বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন বরাদ্দের গড় থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন বরাদ্দ রয়েছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে, বছরে গড়ে ৩০ হাজার ১৯৮ দশমিক ২৯ কোটি টাকা (২১ শতাংশ), শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে গড়ে ২৫ হাজার ৫০৪ দশমিক ৪৩ কোটি টাকা (১৮ শতাংশ), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে গড়ে ২১ হাজার ১৮২ কোটি টাকা (১৫ শতাংশ) এবং জ্বালানি ও শক্তি খাতে গড়ে ১৭ হাজার ৭২০ কোটি টাকা (১৩ শতাংশ)। স্বাভাবিকভাবেই এসব খাতভুক্ত প্রতিষ্ঠানে সরকারি ক্রয়ের পরিমাণও বেশি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্ভাব্য উন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা হতে পারে বলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা দেওয়া হয়।[১৮]

চিত্র ১ : সরকারি ক্রয়ের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)

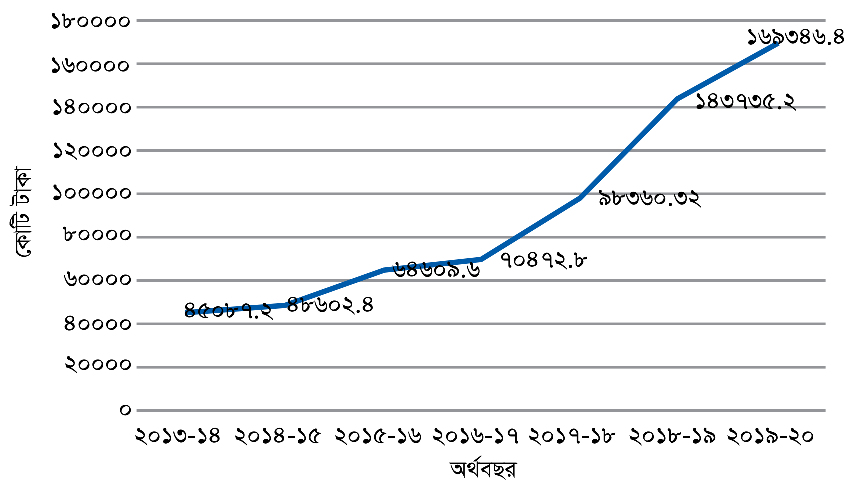

জাতীয় বিভিন্ন পরিকল্পনায় ক্রয়-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২-তে ক্রয়-প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি প্রতিরোধকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এ জন্য প্রণীত আইনের উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯] পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-এ 'স্বচ্ছ সংগ্রহ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা'র কথা বলা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (অর্থবছর ২০১১-২০১৫) দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের একটি মাধ্যম হিসেবে 'ই-গভর্নেন্স' যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রবর্তনের উল্লেখ করা হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (অর্থবছর ২০১৫-২০২০) যেসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যেমন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবহন, পানিসম্পদ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি সবগুলোর সঙ্গেই সরকারি ক্রয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।[২০]

২০০৩ সাল পর্যন্ত সাধারণ আর্থিক বিধিমালার একটি সংকলনের (সিজিএফআর) মাধ্যমে সরকারি ক্রয়পদ্ধতি ও চর্চা নিয়ন্ত্রণ করা হতো। সরকারি ক্রয়ে সংস্কারের অংশ হিসেবে ২০০২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগের (আইএমইডি) অধীনে সিপিটিইউ গঠন করা হয়। ২০০৬ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন' প্রণীত হয় এবং ২০০৮ সালে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি' (পিপিআর) জারি করা হয়। ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে আইন ও বিধিমালা কার্যকর করা হয়।

একটি জাতীয় পোর্টাল হিসেবে ই-জিপি সিস্টেম তৈরি করা হয়, যা ব্যবহার করে সব ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান নিরাপদ ওয়েব ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করে যাবতীয় ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারে। ই-জিপি সিস্টেমে যেসব কাজ সম্পাদন করা যায় সেগুলো হলো– বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন

করা, দরপত্র আহ্বান করা, প্রস্তাবের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন, কোটেশনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন, দরপত্র বা আবেদন বা প্রস্তাব তৈরি ও জমা, দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, আর্থিক লেনদেন, ইনফরমেশন সিস্টেমের প্রধান প্রধান নির্দেশকের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যাবলি পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সংশোধন।

চিত্র ২ : ই-জিপি প্রক্রিয়া

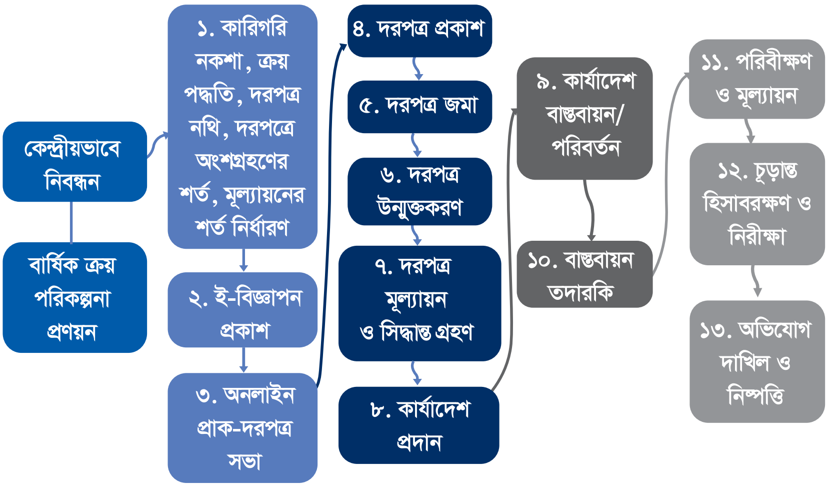

গবেষণার ফলাফল

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) (৫০ শতাংশ)। এর পরে রয়েছে পল্লী বিদ্যুৎ (আরইবি) (৪৪ শতাংশ), পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) (৪৩ শতাংশ) ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) (৪২ শতাংশ) (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য)।

প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাপ্ত স্কোর থেকে দেখা যায়, সবগুলো প্রতিষ্ঠানই প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো ও প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে (৬০ থেকে ৭৫ শতাংশ), তবে সওজ ও আরইবির সক্ষমতা অন্য দুটো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভালো। ই-জিপি প্রক্রিয়া মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রায় সব প্রতিষ্ঠান কাছাকাছি অবস্থানে (৫৮ থেকে ৬৪ শতাংশ) রয়েছে। অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনো অনেক উন্নতির সুযোগ রয়েছে। ই-জিপি ব্যবস্থাপনা ও কার্যকারিতায় কোনো প্রতিষ্ঠানই কোনো স্কোর পায়নি বলে দেখা যায়। আবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে সব প্রতিষ্ঠানের স্কোর অনেক কম (১৯ থেকে ৩০ শতাংশ)।

সারণি ৪ : একনজরে সব নির্দেশকে প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান

ক্ষেত্র	এলজিইডি	সওজ	পাউবো	আরইবি
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	আর্থিক সক্ষমতা	আর্থিক সক্ষমতা	আর্থিক সক্ষমতা	আর্থিক সক্ষমতা
	ভৌত সক্ষমতা	ভৌত সক্ষমতা	ভৌত সক্ষমতা	ভৌত সক্ষমতা
	কারিগরি সক্ষমতা	কারিগরি সক্ষমতা	কারিগরি সক্ষমতা	কারিগরি সক্ষমতা
	মানবসম্পদ	মানবসম্পদ	মানবসম্পদ	মানবসম্পদ
	ই-জিপির ব্যবহার	ই-জিপির ব্যবহার	ই-জিপির ব্যবহার	ই-জিপির ব্যবহার
	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
	ক্রয়সীমা	ক্রয়সীমা	ক্রয়সীমা	ক্রয়সীমা
ই-জিপি প্রক্রিয়া	ই-জিপিতে নিবন্ধন	ই-জিপিতে নিবন্ধন	ই-জিপিতে নিবন্ধন	ই-জিপিতে নিবন্ধন
	টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া	টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া	টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া	টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া
	প্রাক-টেন্ডার মিটিং	প্রাক-টেন্ডার মিটিং	প্রাক-টেন্ডার মিটিং	প্রাক-টেন্ডার মিটিং
	ই-বিজ্ঞাপন	ই-বিজ্ঞাপন	ই-বিজ্ঞাপন	ই-বিজ্ঞাপন
	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া
	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ই-জিপি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা
	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ক্ষেত্র	এলজিইডি	সওজ	পাউবো	আরইবি
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি	অভিযোগ নিষ্পত্তি	অভিযোগ নিষ্পত্তি	অভিযোগ নিষ্পত্তি	অভিযোগ নিষ্পত্তি
	নিরীক্ষা	নিরীক্ষা	নিরীক্ষা	নিরীক্ষা
	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ
কার্যকারিতা	অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতি
	কাজের মান	কাজের মান	কাজের মান	কাজের মান

চিত্র ৩ : সার্বিক স্কোর

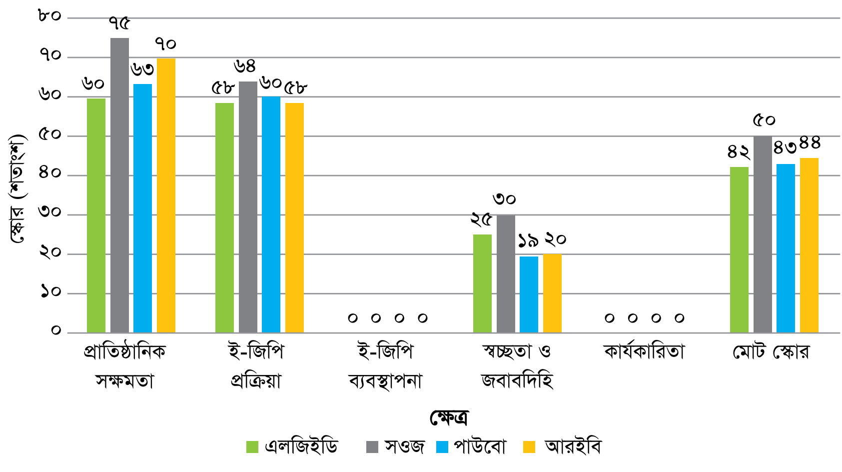

গবেষণার স্কোর থেকে আরও দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি নয়টি নির্দেশকে উচ্চ স্কোর পেয়েছে সওজ; এর পরই রয়েছে আরইবি (ছয়টি নির্দেশকে উচ্চ স্কোর)। মধ্যম স্কোর সবচেয়ে বেশি নির্দেশকে পেয়েছে এলজিইডি ও পাউবো (সাতটি নির্দেশকে)। অন্যদিকে সবগুলো প্রতিষ্ঠানই সবচেয়ে বেশি নিম্ন স্কোর পেয়েছে আটটি নির্দেশকে (বিস্তারিত চিত্র ৪)। একনজরে সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সব নির্দেশকে অবস্থান দেখানো হয়েছে সারণি ৫-এ।

চিত্র ৪ : প্রতিষ্ঠান ও ধরনভেদে স্কোর

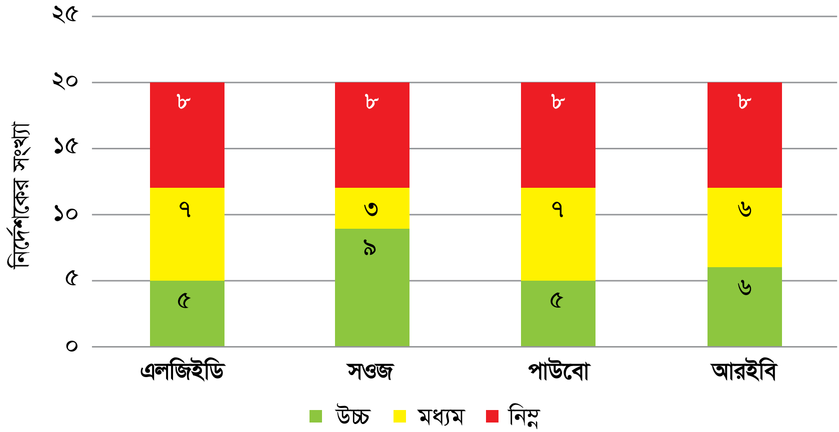

সারণি ৫ : একনজরে গ্রেডিং

ক্ষেত্র	এলজিইডি	সওজ	পাউবো	আরইবি
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	ঘাটতিপূর্ণ	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক
ই-জিপি প্রক্রিয়া	ঘাটতিপূর্ণ	সন্তোষজনক	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ
ই-জিপি ব্যবস্থাপনা	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক
কার্যকারিতা	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক
সার্বিক স্কোর	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ

গ্রেডিং অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সার্বিকভাবে 'ঘাটতিপূর্ণ'। তবে ই-জিপি ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং কার্যকারিতায় অবস্থান উদ্বেগজনক। যেসব নির্দেশকে অবস্থান উদ্বেগজনক সেগুলো হচ্ছে– বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, প্রাক-দরপত্র সভা, ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা, কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি, নিরীক্ষা, কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ, অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং কাজের মান। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

ক্ষেত্র ১ : প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছে সওজ (৭৫ শতাংশ); এর পরই রয়েছে পাউবো (৬৩ শতাংশ)। দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই ই-জিপি পরিচালনার জন্য আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে এবং ই-জিপি পরিচালনার জন্য আলাদা করে অর্থ বরাদ্দেরও দরকার

নেই। ভৌত ও কারিগরি সক্ষমতার দিক থেকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে সওজ ও আরইবির সক্ষমতা তুলনামূলক বেশি। তবে এলজিইডি (উপজেলা পর্যায়) ও পাউবোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের ঘাটতি রয়েছে। উপরন্তু কিছু কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে ই-জিপি পরিচালনায় সমস্যা হয়। কারিগরি সক্ষমতার ক্ষেত্রে পাউবো, আরইবি ও এলজিইডিতে (উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে) প্রয়োজনের তুলনায় কম কম্পিউটার, সার্ভার স্লো থাকা, ইন্টারনেটের গতি কম থাকা, ব্রডব্যান্ড সংযোগ না থাকার সমস্যা বিদ্যমান। ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াই-ফাই সংযোগ কিংবা অফিস কর্তৃক ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হলেও তা অকার্যকর থাকতে দেখা গেছে।

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয়সংখ্যক জনবল থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যেমন এলজিইডির উপজেলা পর্যায়ে ও পাউবোর কার্যালয়গুলোতে অনুমোদিত পদের বিপরীতে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। এলজিইডির অধিকাংশ উপজেলা প্রকৌশলীকেই একাধিক উপজেলার দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। ক্রয়-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি, বিশেষ করে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কম্পিউটারের মাধ্যমে ই-জিপি পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জ্ঞান বা সদিচ্ছার ঘাটতি রয়েছে (যেমন আরইবি)। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসের কম্পিউটার অপারেটররা তাদের হয়ে ই-জিপি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এলজিইডির কোনো কোনো উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পাননি। আরইবির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কার্যালয় পর্যায়েও প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে।

ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী ই-জিপি পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও সব সময় পুরোপুরি অনুসরণ করা হয় না। কোনো প্রতিষ্ঠানেই সব ক্রয়ে ই-জিপি ব্যবহার করা হয় না। প্রতিষ্ঠানভেদে সর্বনিম্ন ২০ থেকে ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্রয় ই-জিপিতে হয় না। জরুরি ভিত্তিতে ক্রয়, আন্তর্জাতিক ক্রয়, কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ই-জিপি ব্যবহৃত হয় না। এ ছাড়া আরইবির সমিতি পর্যায়ের ক্রয়ে ই-জিপি অনুসরণ করা হয় না। এলজিইডির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দরপত্র ও ক্ষেত্রবিশেষে শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত ক্রয়-প্রক্রিয়ায় ই-জিপি অনুসরণ করা হয় না। এ ছাড়া উপজেলা পরিষদের ক্রয়ে অনেক জায়গায়ই ই-জিপি পুরোপুরি চালু হয়নি। সামরিক বাহিনীর দ্বারা সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে ই-জিপি অনুসরণ করা হয় না।

কোনো প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা দেওয়া হয় না। কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কত টাকার ক্রয়ের কার্যাদেশ দিতে পারবেন তা ‘ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার’ অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠানে নির্ধারণ করা আছে। তবে প্রতিষ্ঠানভেদে এই ক্রয়সীমার কিছুটা তারতম্য রয়েছে।

ক্ষেত্র ২ : ই-জিপি প্রক্রিয়া

ই-জিপি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছে সওজ (৬৪ শতাংশ); এর পরই রয়েছে পাউবো (৬০ শতাংশ)। গাইডলাইন অনুযায়ী সব ব্যবহারকারীর ই-জিপি ব্যবস্থায় নিবন্ধিত হওয়া

বাধ্যতামূলক হলেও তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান ই-জিপিতে নিবন্ধিত– ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার ও ব্যাংক। ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হলেও ঠিকাদারকে নিয়মমাফিক ফি দিয়ে নিবন্ধন করতে হয়। ই-জিপি চালুর প্রথম দিকে অধিংকাশ ঠিকাদারই সংশ্লিষ্ট অফিসের সহায়তায় নিবন্ধিত হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার অপারেটরদের মাধ্যমে ই-জিপি আইডি খোলা ও নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে। তবে কোনো কোনো ঠিকাদার নিজেই নিবন্ধন করেছেন।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানে টেন্ডার ওপেনিং কমিটি (টিওসি) গঠন করা হয়। তবে কোনো কোনো সময় টিওসির সদস্যদের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার অপারেটররা তাদের পক্ষে লগ-ইন করে দরপত্র খোলেন। দরপত্র খোলার আগে ঠিকাদারদের পরিচয় গোপন থাকার নিয়ম থাকলেও কোনো প্রতিষ্ঠানেই এটি গোপন থাকে না। উপরন্তু কোনো কোনো কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটররাই টাকার বিনিময়ে ঠিকাদারদের হয়ে দরপত্র দাখিল করেন। কোনো প্রতিষ্ঠানই প্রাক-টেন্ডার মিটিং করে না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সব প্রতিষ্ঠানেই দৈনিক পত্রিকা ও ই-জিপি পোর্টালে ক্রয়সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হলেও কিছু কিছু উপজেলার দরপত্র এখনো ই-জিপিতে না হওয়ায় সেগুলোর বিজ্ঞাপন ই-জিপি পোর্টালে দেওয়া হয় না।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই নিয়ম অনুযায়ী টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (টিইসি) গঠন ও দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। সওজ ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠানে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র মূল্যায়ন করা হয় না। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ঠিকাদারদের জমা দেওয়া কাগজপত্র পূর্ণাঙ্গভাবে যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রেও ঘাটতি বিদ্যমান। ঠিকাদারদের কোনো ডেটাবেইস না থাকায় তাদের কাজের অভিজ্ঞতা যাচাই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করতে হয়। মূল্যায়ন শেষে যে ঠিকাদার সব বিবেচনায় যোগ্য বিবেচিত হন, তাকে কাজের জন্য চূড়ান্ত বাছাই করা হয়। চূড়ান্তভাবে বাছাইয়ের পর ই-জিপি সিস্টেমে ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

ক্ষেত্র ৩ : ই-জিপি ব্যবস্থাপনা

ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনায় ঠিকাদারদের কর্ম-পরিকল্পনা দাখিল করতে হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে ঠিকাদারকে ই-জিপি চুক্তি ব্যবস্থাপনা টুলস ব্যবহার করতে হয়। তবে ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা কোনো প্রতিষ্ঠানেই এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। অন্যদিকে কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি প্রক্রিয়াও এখনো ই-জিপি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

ক্ষেত্র ৪ : স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রের অধীনে তিনটি নির্দেশকে সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছে সওজ (৩০ শতাংশ); এর পরই রয়েছে এলজিইডি (২৫ শতাংশ)। এই তুলনায় আরইবি (২০ শতাংশ) ও পাউবোর (১৯ শতাংশ) স্কোর বেশ কম। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলজিইডি ও সওজ কার্যালয়গুলোতে কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বিদ্যমান। অন্যদিকে পাউবো ও আরইবিতে অভিযোগ করলেও সমাধান না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই নিয়মিত নিরীক্ষা (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) হয়, যার মধ্যে ই-জিপির কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত। আবেদনের ভিত্তিতে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সাধারণ জনগণের অভিগম্যতা রয়েছে। তবে ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী সিস্টেমে অডিট লগ রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা থাকলেও কোনো প্রতিষ্ঠানই এটি মেনে চলে না। নিরীক্ষা করার সময় ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করা হয় না; বরং কাগজে-কলমে ই-জিপি কার্যক্রমের নিরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি ১৯৭৯' অনুযায়ী সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সম্পদের বিবরণী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দাখিল করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানেরই কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্পদের তথ্য প্রকাশ করেন না।

ক্ষেত্র ৫ : কার্যকারিতা

ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে, টেন্ডার বাক্স ছিনতাই, টেন্ডার সাবমিট করতে না দেওয়া, কার্যালয় ঘেরাও ইত্যাদি বন্ধ হয়েছে। তবে এগুলো বন্ধ হলেও দুর্নীতি কমার সঙ্গে ই-জিপির তেমন কোনো সম্পর্ক নেই বলে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাই মতপ্রকাশ করেছেন। ই-জিপি প্রবর্তন সত্ত্বেও নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান।

রাজনৈতিকভাবে কাজের নিয়ন্ত্রণ ও ঠিকাদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় কোনো বিশেষ কাজে কারা টেন্ডার সাবমিট করবে, সেটা রাজনৈতিক নেতা; বিশেষ করে স্থানীয় সাংসদ ঠিক করে দেন। অনেক ক্ষেত্রে একটি বড় লাইসেন্সের অধীনে কাজ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা তার কর্মীদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহেলা, নিজেরা কাজ না করে কম্পিউটার অপারেটরদের মাধ্যমে মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করানো, নম্বর বাড়িয়ে-কমিয়ে আনুকূল্য দেওয়া ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে। অফিস কর্মকর্তা কর্তৃক ঠিকাদারদের রেট শিডিউল জানিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অফিসের কম্পিউটার অপারেটরদের সাহায্যে নিয়মবহির্ভূত কাজ করানো হয়।

লিমিটেড টেন্ডার মেথড (এলটিএম)-এ কার্যাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ঘুষ আদায় করার অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া কাজ তদারকি, অগ্রগতি প্রতিবেদনে ভুল তথ্য দেওয়া, কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বিল তুলতে ঘুষ আদায় করার অভিযোগ রয়েছে।

ঠিকাদারদের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ রয়েছে। ওপেন টেন্ডার মেথড (ওটিএম)-এ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আগে থেকেই সিন্ডিকেট করা থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় ঠিকাদার, রাজনৈতিক নেতা ও সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া অবৈধভাবে কাজ বিক্রি করে দেওয়া বা সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় এবং একজনের সার্টিফিকেট ও লাইসেন্স ব্যবহার করে কাজ নেওয়া ও অন্যজনের কাজ করা হয়। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের চাঁদা দেওয়া বা দিতে বাধ্য হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাইরের ঠিকাদারদের কাজ করতে না দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে ই-জিপি পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ হওয়ার কারণে ভালো ও দক্ষ ঠিকাদারদের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে কাজ বাস্তবায়নে দুর্নীতি কম হওয়াসহ কাজের মান ভালো

হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের অধিকাংশের মতে, ই-জিপির সঙ্গে কাজের মানের সম্পর্ক নেই। তথ্যদাতাদের মতে, অনেক ক্ষেত্রে কাজের মান কমে গেছে এবং দুর্নীতি ও কাজ বিক্রি করার কারণে কাজ ভালো তা হয় না।

ই-জিপির ইতিবাচক প্রভাব

ই-জিপি প্রবর্তনের পর সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রথমত, ই-জিপির ফলে শিডিউল ছাপানো, শিডিউল কেনা ও জমা দেওয়া, নথি সংগ্রহ ও যাচাই করা এগুলো কমে যাওয়ার কারণে সময়ক্ষেপণ কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের কার্যালয়ে ক্রয়ের সুবিধা, দেশের যেকোনো জায়গা থেকে দরপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তৃতীয়ত, দরপত্র জমাসংক্রান্ত যেসব সমস্যা; যেমন দরপত্র নিয়ে সব ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি, বোমা হামলা, দরপত্র বাক্স ছিনতাই ও চুরি, দরপত্র জমায় বাধা দেওয়া, দরপত্র বাক্স নিয়ে আসতে বাধাসহ টেন্ডারবাজি ইত্যাদি দূর হয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। চতুর্থত, দরপত্র মূল্যায়নে দুর্নীতি কমে গেছে। আগে দরপত্র হারিয়ে যাওয়া, দরপত্রের কাগজপত্র হারানো বা চুরি হওয়া ইত্যাদি ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। এখন কোনো নথি পরিবর্তন করা যায় না। পঞ্চমত, ই-জিপির কারণে সবার অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ই-জিপি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা

তবে ই-জিপি বাস্তবায়নে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতাও চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রথমত, উপজেলা পর্যায়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভৌত ও কারিগরি সমস্যা বিদ্যমান, যার মধ্যে ইন্টারনেটের কম গতি, লজিস্টিকসের ঘাটতি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি, টেন্ডার ওপেন করার জন্য অপর্যাপ্ত সময় (মাত্র এক ঘণ্টা), ঠিকাদারদের নথিপত্র ম্যানুয়াল ভেরিফিকেশন হওয়ার ফলে সময়ক্ষেপণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত ও প্রশিক্ষিত জনবলের ঘাটতির ফলে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের ওপর কাজের চাপ বাড়ছে। তৃতীয়ত, দক্ষতার ঘাটতির কারণে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়েছে। চতুর্থত, ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি বাস্তবায়নে ঘাটতি বিদ্যমান, যেমন সম্পূর্ণভাবে ই-জিপি অনুসরণ না করা, সব ক্রয় এখনো ই-জিপিতে না করা, প্রকল্পের কাজ পরিবর্তন হওয়ার অজুহাতে এপিপি ওয়েবসাইটে না দেওয়া এবং প্রাক-দরপত্র মিটিং না করা।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় (সিপিটিইউ) পর্যায়ে কিছু সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, সব ঠিকাদারের তথ্যসংবলিত কোনো কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার এখনো নেই। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় বা সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়নকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। তৃতীয়ত, দরদাতাদের জন্য সমন্বিত সনদের ব্যবস্থা নেই। চতুর্থত, ক্রয়সংক্রান্ত প্রধান অংশীজন (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার ও ব্যাংক) ই-জিপিতে নিবন্ধিত হলেও অন্যান্য অংশীজন এখনো নিবন্ধিত নয়। সবশেষে ঠিকাদারদের প্রশিক্ষণও অপর্যাপ্ত।

উপসংহার ও সুপারিশ

সার্বিকভাবে বলা যায়, সরকারি ক্রয়ে ই-জিপির প্রবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও এখনো সব প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয়ে এর ব্যবহার হচ্ছে না; ই-জিপির ব্যবহার এখনো ক্রয়াদেশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ই-জিপি প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য– দুর্নীতি হ্রাস ও কাজের মানের ওপর ই-জিপির কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না। ক্রয়-প্রক্রিয়া সহজতর হলেও কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ, সিন্ডিকেট এখনো কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। কার্যাদেশ বিক্রি, অবৈধ সাব-কন্ট্রাক্ট, কাজ ভাগাভাগির কারণে কাজের মানের ওপর কোনো ইতিবাচক প্রভাব নেই। ই-জিপি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো কোনো কোনো কাজে ম্যানুয়াল পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। ফলে ই-জিপির মূল উদ্দেশ্য (অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, নিরপেক্ষ মূল্যায়ন) অনেকখানি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে বলা যায়, ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে ম্যানুয়াল থেকে কারিগরি পর্যায়ে সরকারি ক্রয়ের উত্তরণ ঘটলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একাংশ দুর্নীতির নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে। বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ ঘটলে ই-জিপির সুফল পুরোপুরি পাওয়া যাবে।

গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে–

১. ই-জিপিকে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ ও সিন্ডিকেটের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে সব পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও জনগুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে অবস্থিত ব্যক্তির রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবসায়িক সম্পর্কের সুযোগ বন্ধ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

২. প্রতিটি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে করতে হবে।

৩. ই-জিপি পরিচালনার জন্য কাজের চাপ ও জনবলকাঠামো অনুযায়ী ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে জনবল বাড়াতে হবে।

৪. ই-জিপির সঙ্গে সম্পর্কিত সব অংশীজনকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য প্রতি জেলায় সিপিটিইউর তত্ত্বাবধানে একটি প্রশিক্ষণ ইউনিট গঠন করতে হবে, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় পর পর ঠিকাদার, ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৫. প্রতিটি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রতি অর্থবছরের শুরুতে তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

ই-জিপি প্রক্রিয়া

৬. প্রতিটি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে প্রাক-দরপত্র মিটিং নিশ্চিত করতে হবে।

৭. ঠিকাদারদের একটি অনলাইন ডেটাবেইস তৈরি করতে হবে, যেখানে সব ঠিকাদারের কাজের অভিজ্ঞতাসহ হালনাগাদ তথ্য থাকবে; কাজের ওপর ভিত্তি করে ঠিকাদারদের আলাদা শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে, যা সঠিক ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

৮. সিপিটিইউর পক্ষ থেকে একটি সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় দরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকতে হবে, যা সব সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করবে।

ই-জিপি ব্যবস্থাপনা

৯. সিপিটিইউর পক্ষ থেকে ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি ই-জিপির অধীনে শুরু করতে হবে।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও কার্যকারিতা

১০. প্রতিটি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী নিরীক্ষা করাতে হবে।

১১. দরপত্রসংক্রান্ত সব তথ্য ও সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের জন্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।

১২. প্রতিটি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ই-জিপির সঙ্গে জড়িত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের আয় ও সম্পদের বিবরণী প্রতিবছর শেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে ও তা প্রকাশ করতে হবে।

১৩. প্রতিটি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে তদারকি করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। এর জন্য স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে তদারকির (কমিউনিটি মনিটরিং) চর্চা শুরু করা যেতে পারে। একইভাবে প্রতিটি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিতভাবে গণশুনানির আয়োজন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ *পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন* ২০০৬, ধারা ২ (৭)।

২ *পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন* ২০০৬, ধারা ২ (৩২)।

৩ বিবিসি বাংলা, 'বালিশ ও পর্দা কেনায় দুর্নীতি নিয়ে কৃষিমন্ত্রী রাজ্জাক : চড়া রাজনৈতিক মূল্য দিতে হবে', ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯, https://www.bbc.com/bengali/news-49651086, (১৬ জানুয়ারি ২০২০); প্রথম আলো, 'পাতানো লটারির তদন্ত হোক', ২২ ডিসেম্বর ২০১১, http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2011-12-22/news/210509 (২ ডিসেম্বর ২০১৯); কালের কণ্ঠ, 'কৃষকের ধান ক্রয়ে কোনো দুর্নীতি সহ্য করা হবে না', ১২ জানুয়ারি ২০২০, https://www.kalerkantho.com/print-edition/priyo-desh/2020/01/12/861371 (২৯ জানুয়ারি ২০২০); ডিবিসি নিউজ, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন ক্রয়ে দুর্নীতি', ৬ ডিসেম্বর ২০১৯, https://dbcnews.tv/news/ (২৮ ডিসেম্বর ২০১৯); বাংলা ট্রিবিউন, 'সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ে দুর্নীতিই সবচেয়ে আলোচিত বিষয় : দুদক চেয়ারম্যান', ২ ডিসেম্বর ২০১৯, https://www.banglatribune.com/others/news/597360/ (২৮ ডিসেম্বর ২০১৯)।

৪ এসএ টিভি, 'ধান ক্রয়ে কোনো দুর্নীতি সহ্য করা হবে না', ১১ জানুয়ারি ২০২০, https://www.satv.tv/ (২৯ জানুয়ারি ২০২০); বিডি নিউজ, 'সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি বন্ধ করবে ই-জিপি : প্রধানমন্ত্রী', ই-জিপির মাধ্যমে সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আরও বলেন, ই-জিপি চালুর মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে এবং বন্ধ হবে দুর্নীতি। ২ জুন

২০১১, https://bangla.bdnews24.com/politics/article501167.bdnews (২৮ ডিসেম্বর ২০১৯)।

৫ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : https://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement (৯ আগস্ট ২০২০)।

৬ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : https://www.eprocure.gov.bd/RegistrationDetails.jsp?lang=bn_IN (৪ অক্টোবর ২০২০)।

৭ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৪, *কারবিং কাপশন ইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট : এ প্র্যাকটিক্যাল গাইড*।

৮ দেখুন বিশ্বব্যাংক, ২০১৩, *এন্টারপ্রাইজ সার্ভেস*; https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2013/bangladesh#corruption (১৬ এপ্রিল ২০২০); ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, *গ্লোবাল কমপিটিটিভনেস রিপোর্ট ২০১৩-২০১৪*; https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014 (১৬ এপ্রিল ২০২০)।

৯ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস : একটি ডায়াগনস্টিক গবেষণা' (২০০৭); 'দ্য স্টেট অব দ্য গভার্নেন্স ইন পাওয়ার সেক্টর অব বাংলাদেশ : প্রবলেমস অ্যান্ড দ্য ওয়ে আউট' (২০০৭); 'সরকারি টেলিযোগাযোগব্যবস্থায় সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' (২০১০); 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর : সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' (২০১৩); 'বিটিসিএল : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' (২০১৪); 'স্বাস্থ্য খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' (২০১৪); 'মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় (২০১০); 'জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড' (২০১৭); 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) : পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' (২০১৭); 'ঢাকা ওয়াসা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' (২০১৯)। এসব গবেষণার প্রতিবেদন ও সারসংক্ষেপের জন্য দেখুন : https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/ (৪ অক্টোবর ২০২০)।

১০ বিশ্বব্যাংক, ২০২০, 'অ্যাসেসমেন্ট অব বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম', © বিশ্বব্যাংক।

১১ ওয়াহিদ আবদাল্লাহ, 'ইফেক্ট অব ইলেকট্রনিক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট : এভিডেন্স ফ্রম বাংলাদেশ', ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার, কার্যপত্র, মে ২০১৫।

১২ ড. মো. শানাভেজ হোসেন, গাজী আরাফাত উজ জামান মার্কনি, রায়হান আহমদ, 'সিটিজেন এনগেজমেন্ট ইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট : এক্সপেরিয়েন্স ফ্রম পাইলট ডিসট্রিক্টস, কেস স্টাডি', বিআইজিডি ও বাংলাদেশ সরকার, সেপ্টেম্বর ২০১৬।

১৩ ড. মির্জা হাসান, মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান, মো. মাহান উল হক, 'ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট : টুওয়ার্ডস অ্যান এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাট দ্য লোকাল লেভেল', পলিসি নোট, আগস্ট ২০১৬, বিআইজিডি ও বাংলাদেশ সরকার।

১৪ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, ২০১৭, *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ)*, (২য় সং)।

১৫ *জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন ২০০৪*, অনুচ্ছেদ ৯। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf (২২ এপ্রিল ২০২০)।

১৬ বিশ্বব্যাংক, ২০২০, 'অ্যাসেসমেন্ট অব বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম', © বিশ্বব্যাংক।

১৭ সিপিটিইউ, *পাবলিক প্রকিউরমেন্ট*, ত্রৈমাসিক নিউজলেটার, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০১৯; https://bangla.cptu.gov.bd/upload/publication/2019-11-27-15-44-17-Newsletter-DIMAPPP-Feb---April--2019.pdf (১৬ এপ্রিল ২০২০)।

১৮ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮*, পৃ. ২৬। http://www.sdg.gov.bd/public/files/upload/5c324288063ba_2_Manifesto-2018en.pdf (২০ এপ্রিল ২০২০)।

১৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২*, পৃ. ২।

২০ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫-১৬ - ২০১৯-২০*। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : https://plandiv.gov.bd/sites/default/files/files/plandiv.portal.gov.bd/files/9d9106e2_828d_4e33_819f_84ec5357ef4f/7th%20Five%20Year%20Plan%20Bangla%20Book.pdf (২১ এপ্রিল ২০২০)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেবা খাত

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

ফাতেমা আফরোজ ও ফারহানা রহমান

গবেষণার প্রেক্ষাপট

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) রাজধানী ঢাকাসহ এর আওতাধীন এলাকাকে পরিকল্পিত, বাসযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব শহরে পরিণত করার লক্ষ্যে গঠিত ও পরিচালিত। দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা অন্যতম। ১৯৮৭ সালে রাজউক গঠিত হওয়ার পর এর আওতাভুক্ত এলাকা ১ হাজার ৫২৮ বর্গকিলোমিটারে উন্নীত করা হয়; যার মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ লাখ এবং বর্তমানে এর জনসংখ্যা প্রায় তিন গুণ।[১] ক্রমবর্ধমান এই জনসংখ্যার আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ভূমি ব্যবহার ও শহরের প্রবৃদ্ধির গ্রহণযোগ্য মাত্রা ও ধরন বজায় রেখে পরিকল্পিত উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কৌশলপত্রে সুষ্ঠু, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১১-এ নগর ও মানব বসতিগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে সেবামুখী, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

রাজউকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক নগর উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। তবে রাজউকের অন্যতম কাজ পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে স্বচ্ছতা, জবাবদিহির ঘাটতিসহ দুর্নীতি ও অনিয়মের নানা অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি রাজউকের আওতাধীন বিস্তীর্ণ এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়নে রাজউকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ঘাটতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের কারণে সম্প্রতি এর ভূমিকা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নির্মিত ইমারতের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ঘাটতির ফলে বিগত কয়েক বছরে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্ঘটনা (যেমন রানা প্লাজা ধস, এফ আর টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি) ব্যাপকভাবে উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। বিদ্যমান ভবনগুলোর অগ্নিনিরাপত্তা ও ভূমিকম্প সহনশীলতা নিয়েও রয়েছে ব্যাপক উদ্বেগ। উল্লিখিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ইমারত নির্মাণের নির্ধারিত বিধির লঙ্ঘন ও অপরিকল্পিত নগর উন্নয়নকে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজউকের সুশাসন সম্পর্কিত এবং রাজউকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিভিন্ন অনিয়মের চিত্র বিভিন্ন সময়ে

* ২০২০ সালের ২৯ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়া রাজউকের ওপর পরিচালিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর গবেষণায় ইমারত নির্মাণে বিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি উঠে এসেছে।[২] এ পর্যন্ত রাজউকের পরিকল্পনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে, কিন্তু সার্বিকভাবে রাজউকের সুশাসনবিষয়ক গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

রাজউকের পরিচিতি ও উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

নগর উন্নয়ন আইন, ১৯৫৩ অনুযায়ী বিভিন্ন সেবা সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে ১৯৫৬ সালে ঢাকা উন্নয়ন ট্রাস্ট (ডিআইটি) গঠিত হয়। পরে ১৯৮৭ সালে ডিআইটিকে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজউকের আওতাধীন এলাকা ঢাকা সিটি করপোরেশন, সাভার, গাজীপুর, কেরানীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ এবং এর মোট আয়তন ১ হাজার ৫২৮ বর্গকিলোমিটার। বর্তমানে রাজউকের কাজ পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ। রাজউকের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকাজের অধীনে রয়েছে ইমারত নির্মাণ সম্পর্কিত কার্যক্রম যেমন ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান, নকশা অনুমোদন ও তদারকি, পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট আইনের বাস্তবায়নসংক্রান্ত তদারকি। ডিআইটি প্রতিষ্ঠার সময়ও এ কাজগুলো আওতাভুক্ত ছিল। তবে সম্প্রতি রাজউকের কাজের ক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যক্রম প্রাধান্য পাচ্ছে।

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী চেয়ারম্যানসহ ছয় সদস্যের নির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে রাজউক পরিচালিত হয়। আইন অনুসারে রাজউকের চেয়ারম্যান প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োজিত। রাজউকের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপক এলাকা পরিচালনার সুবিধার্থে ২০১৪ সালে রাজউককে আটটি জোনে বিভক্ত করে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। রাজউক সম্প্রতি উন্নয়ন ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির সুশাসন নিশ্চিতে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদনে অনলাইন আবেদনের সূচনা, ই-নথি কার্যক্রম গ্রহণ, ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদন ও ই-নথি সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ (বিশেষ প্রকল্প ও বহুতল ভবনের নকশা অনুমোদনে ১০টি প্রতিষ্ঠানের এবং আবাসিক ভবনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের বাধ্যবাধকতা বাতিল; সব ক্ষেত্রে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র নেওয়ার বিধান বাতিল, ইমারত নির্মাণে ব্যত্যয় ও বিচ্যুতি রোধে 'অকুপেন্সি' সনদ গ্রহণ উদ্বুদ্ধকরণে মতবিনিময় সভার আয়োজন। এ ছাড়া রাজউকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে অবৈধ ইমারত ও স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য রাজউকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- সুশাসনের ক্ষেত্রে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
- বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা চিহ্নিত করা; এবং
- অনিয়ম, দুর্নীতিসহ রাজউকের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

উপরের উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ গবেষণায় রাজউকের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি, অবকাঠামো, লজিস্টিক্স, দক্ষতা, নিরীক্ষা, বাজেট ইত্যাদি), ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়, পরিকল্পনা প্রণয়ন (ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান-ড্যাপ) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন ও নীতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি ও সময়

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। তবে কিছু ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও মাঠ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। রাজউকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, সেবাগ্রহীতা, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, প্রকৌশলী ও নকশাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, নীতিমালা, নির্দেশিকা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, রাজউকের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি বিশ্লেষণকাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি এবং শুদ্ধাচার এই নির্দেশকগুলোর ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৮ সালের নভেম্বর থেকে শুরু করে ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

গবেষণার ফলাফল

আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

রাজউকের কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের আইনি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন নগর উন্নয়ন (টাউন ইম্প্রুভমেন্ট) আইন, ১৯৫৩-এ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের যোগ্যতার মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। এই বিধানের ফলে রাজউকের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যেমন প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ ও স্থপতি নিয়োগ না হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। আবার ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২-এ দুর্ঘটনার ভয়াবহতার মাত্রা বিবেচনায় নকশা অনুমোদন ও বাস্তবায়নে আইনের ব্যত্যয়ের শাস্তি সীমিত (৫০ হাজার টাকা বা ৭ বছর কারাদণ্ড বা উভয়ই) হওয়ায় আইন লঙ্ঘনের প্রবণতা দেখা যায়।

এ ছাড়া ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮-এ বহুতল ভবনের সংজ্ঞায়নে দেশের অন্যান্য আইনের সঙ্গে অসংগতি রয়েছে। বিধিমালায় দশতলা বা ৩৩ মিটারের ঊর্ধ্বে নির্মিত ভবনকে বহুতল ভবন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, ২০০৬ অনুযায়ী ২০ মিটার বা তার ঊর্ধ্বে নির্মিত ভবনকে, ন্যাশনাল ফায়ার প্রটেকশন অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী ২৩ মিটার বা তার ঊর্ধ্বে নির্মিত ভবনকে এবং অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ অনুযায়ী সাততলা বা তার ঊর্ধ্বে নির্মিত ভবনকে বহুতল ভবন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ফলে দশতলা পর্যন্ত, বিশেষ করে সাত থেকে দশতলা উচ্চতার ভবন অগ্নিনিরাপত্তার বাইরে রয়েছে। নকশা অনুমোদনে অগ্নিনিরাপত্তা ও কাঠামোগত নকশা জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকায় আইনের লঙ্ঘন ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে। আবার ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুযায়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজউক অনুমোদিত নকশার আলোকে সব নকশার (নির্মাণ, কাঠামো ও সেবাসংক্রান্ত নকশা) পর্যাপ্ততা ও উপযুক্ততার 'যাবতীয় দায়িত্বভার' নকশা তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থপতি বা প্রকৌশলীর। এ ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণে পরিদর্শকসহ অন্যান্য কর্মকর্তার দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট না করায় ভবনের নকশার পর্যাপ্ততা ও উপযুক্ততা নিশ্চিতের দায়িত্ব রাজউক কর্তৃক এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

এ ছাড়া বিধিমালায় ঐতিহাসিক, স্থাপতিক, পরিবেশগত কিংবা কৃত্তিগত নিদর্শনের পার্শ্ববর্তী স্থানে নির্মিত বৃহদায়তন বা বিশেষ ইমারতের উচ্চতা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। ফলে এসব নিদর্শনের সুরক্ষা ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। অন্যদিকে, ঢাকা উন্নয়ন ট্রাস্ট (ভূমি বরাদ্দ) বিধিমালা, ১৯৬৯-এ কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হলে সেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত কোটা সম্পর্কিত কোনো নির্দেশনা নেই, ফলে প্রকল্পভেদে কোটার ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। প্লটের জন্য আবেদনকারী হিসেবে 'জাতীয় পর্যায়ে অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তি'র মানদণ্ড স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সুস্পষ্ট মানদণ্ড না থাকায় এই বিধির অপব্যবহার বা বিতর্কিত ব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তরা প্লট বা ফ্ল্যাট কী হারে বরাদ্দ পাবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে প্রকল্পভেদে প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভিন্নতা ও অনিয়মের ঝুঁকি রয়েছে।

আবার বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪-এ প্লট গ্রহীতা কত সময়ের মধ্যে ইমারত নির্মাণের কাজ শুরু করবেন, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি। ফলে প্লট গ্রহীতারা জমির দাম বৃদ্ধির আশায় ইমারত নির্মাণ না করে প্লট খালি ফেলে রাখেন। এ ছাড়া রাজউকের নিজস্ব কোনো আর্থিক নির্দেশিকা ও আর্থিক কর্তৃত্বের বণ্টন সুনির্দিষ্ট করা নেই। আবার পুলের গাড়ি ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালাও নেই।

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত

জনবলের স্বল্পতা : রাজউকে অনুমোদিত পদের বিপরীতে পর্যাপ্ত জনবল নেই। একাধিক অনুমোদিত পদের বিপরীতে জনবল শূন্য রয়েছে। অনুমোদিত ১ হাজার ৯৮০টি পদের মধ্যে ১ হাজার ১৮৭টি

পদে জনবল কর্মরত রয়েছেন। কর্মরত নারীদের হার মাত্র ৯ দশমিক ৭ শতাংশ। সার্বিকভাবে অনুমোদিত পদের মধ্যে ৪০ দশমিক ১ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ পদ যেমন প্রধান স্থপতি, প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, নগর, উপনগর ও সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ, অথরাইজড ও সহকারী অথরাইজড অফিসার এবং ইমারত পরিদর্শক পদ বর্তমানে খালি রয়েছে। এ ছাড়া কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলেরও ঘাটতি রয়েছে। যেমন বর্তমানে সদস্য-পরিকল্পনা হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়নি। আবার কিছু কম্পিউটার অপারেটর পদে কারিগরি দক্ষতাহীন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া রাজউকে বিশেষায়িত কাঠামোগত প্রকৌশলী নেই।

নিয়োগ, পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি : রাজউকে নবম থেকে বিশতম গ্রেড পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে জনবল নিয়োগের সময় জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, চেয়ারম্যানের ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে কারিগরি পদে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয় না। কিছু ক্ষেত্রে রাজউকের স্থায়ী কর্মকর্তাদের পদোন্নতি না দিয়ে মন্ত্রণালয় থেকে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়। আবার সুবিধাজনক এলাকা বা জোনে পদায়ন ও বদলি এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রেও একই ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। পছন্দনীয় স্থান বা পদে দুই লাখ থেকে আড়াই লাখ টাকা এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৩০ হাজার থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত নিয়মবহির্ভূতভাবে লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

প্রশিক্ষণসংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম : রাজউকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। আবার প্রতিবেদন লেখা, তদারকি ও যথাযথ দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতিও লক্ষণীয়। এ ছাড়া প্রশিক্ষণের জন্য কর্মী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের রাজউক পরিচালিত প্রকল্প সম্পর্কিত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ভ্রমণের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এ ছাড়া প্রতিটি প্রকল্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়; যা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন যাচাই না করেই করা হয়।

রাজউকের আয়-ব্যয়

রাজউক তার পরিচালনা এবং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নিজস্ব রাজস্ব আয় ও মূলধন আয়ের ওপর নির্ভরশীল। নিজস্ব প্রকল্পের পাশাপাশি সরকারি বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে রাজউক সরকারি অনুদান গ্রহণ করে। রাজউকের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও তা একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের হিসাব থেকে দেখা যায়, প্রতি অর্থবছরে রাজউকের উদ্বৃত্ত আয় (২৫ দশমিক ৩ থেকে ৬০ দশমিক ১ শতাংশ) থাকে (সারণি ১)।

সারণি ১ : রাজউকের নিজস্ব মোট প্রকৃত আয় ও ব্যয় (কোটি টাকায়)[৩]

অর্থবছর	রাজস্ব আয়*	মূলধন আয়#	মোট আয়	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	পরিচালন ব্যয়	বিনিয়োগ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত আয় (হার)
২০১৪-১৫	২৩৮	১২৬৭	১৫০৫	১২১১	৩৯	৭৭২	৮১১	৬৯৪ (৪৬.১%)
২০১৫-১৬	২৩১	৪০৭৯	৪৩১০	১৭৪৭	৫৮	১৭৯০	১৮৪৮	২৪৬২ (৫৭.১%)
২০১৬-১৭	২৪৬	৩৩৯১	৩৬৩৭	২২৪৮	৭৪	১৩৭৬	১৪৫০	২১৮৭ (৬০.১%)
২০১৭-১৮	৪৯৩	১৪২০	১৯১৩	১৬৫৫	৭৭	১৩৫১	১৪২৮	৪৮৫ (২৫.৩%)

তবে বাজেট পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে রাজউকের সমক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। যে পরিমাণ বরাদ্দ দেওয়া হয় তা খরচ করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, যানবাহন, আসবাব ও যন্ত্রপাতি বাবদ সংশোধিত বাজেটে যথেষ্ট বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও তা খরচ করা হয় না। ফলে প্রয়োজনীয় যানবাহন, আসবাব ও যন্ত্রপাতি সরবরাহে ঘাটতি থাকে। আবার ইমারত পরিদর্শকদের পরিদর্শনের জন্য যে পরিমাণ মোটরসাইকেল দেওয়া হয়েছে তা-ও প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। এ খাতে প্রতিবছর অর্থ বরাদ্দ থাকলেও ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মধ্যে শুধু ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোটরসাইকেল কেনা বাবদ ব্যয় করা হয়েছে।

অবকাঠামো ও লজিস্টিকসসংক্রান্ত

রাজউকে অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান। আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোর দুটিতে নিজস্ব অফিস ভবন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু বিভাগ বা শাখার কার্যক্রম নেই। আবার প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে কক্ষ স্বল্পতা, বসার জায়গার স্বল্পতা ও টয়লেটের স্বল্পতা রয়েছে। শুধু প্রধান কার্যালয়ে দর্শনার্থী কক্ষ রয়েছে; আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে নেই। আবার সেবাগ্রহীতাদের জন্য বসার স্থান ও চেয়ারের সংখ্যা প্রধান ও আঞ্চলিক উভয় কার্যালয়ে অপর্যাপ্ত। এ ছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী আসবাব ও কম্পিউটার নেই এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্প তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ি নেই।

ডিজিটাইজেশন

'ম্যানুয়াল' পদ্ধতিতে রাজউকে মৌজাভিত্তিক নকশা অনুমোদনের এবং প্লট ও ফ্ল্যাট-সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ করা হয়, যার ফলে সেবা পেতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং অনেক সময় নথি হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। বর্তমানে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও ইমারত নির্মাণ নকশা অনুমোদনে অনলাইন আবেদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত কোনো গাইডলাইন নেই এবং এ

ক্ষেত্রে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির ঘাটতি রয়েছে। ফলে সেবাগ্রহীতারা রাজউক কার্যালয়ে এসে কর্মচারীদের সহায়তায় অনলাইন আবেদন করেন। এ ছাড়া ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র এবং নকশা অনুমোদনে সংযোগ না থাকার ফলে নকশা অনুমোদনের জন্য আবেদনের সময় ভূমিসংক্রান্ত নথিপত্র জমা দিতে হয় এবং পুনরায় তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়

রাজউকের আওতাভুক্ত এলাকায় রাজউকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায়; বিশেষ করে ভূমি অফিস (এসি ল্যান্ড), ওয়াসা, বিদ্যুৎ বিভাগ, তিতাস গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস, সিভিল এভিয়েশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো কাঠামো অনুসরণ করা হয় না। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো দেরিতে জবাব বা নথি সংগ্রহ করে। সময়মতো ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র, ইমারত নির্মাণ নকশা অনুমোদন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রস্তুতি ব্যাহত হয়। কাজগুলো সম্পাদনে দীর্ঘসূত্রতা হয়।

তথ্য সরবরাহে স্বচ্ছতা

রাজউকের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব রয়েছে। যেমন বাজেট, ২০১৬-১৭ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, প্রকল্পের প্রস্তাবনা, প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দের মানদণ্ড বা নির্ণায়ক, প্রাপকের ধরন ও কোটা, প্লট বা ফ্ল্যাট হস্তান্তর বা বরাদ্দের সংশোধনী সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য নেই। আবার প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর (সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি ও বেসরকারি এবং জাতীয় পর্যায়ে অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তি ইত্যাদি) কোটার হার ও বরাদ্দের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নির্ধারক ইত্যাদি সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয় না। এ ছাড়া ওয়েবসাইটের সব তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না। আবার রাজউকে নাগরিক সনদ থাকলেও তা শুধু ওয়েবসাইটে পূর্ণাঙ্গভাবে এবং প্রধান কার্যালয়ের সামনে কিয়দংশ প্রদর্শন করা রয়েছে। তবে রাজউকের আঞ্চলিক কার্যালয়ে নাগরিক সনদ প্রদর্শন করা হয় না। আবার প্রধান কার্যালয়ে নাগরিক সনদের কিয়দংশ প্রদর্শন করা হলেও সেখানে কোন সেবার জন্য কত ফি নির্ধারিত রয়েছে, সে-সংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই। এ ছাড়া সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুসারে রাজউকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের তথ্য জমা দেওয়া কিংবা প্রকাশ করা হয় না।

জবাবদিহি

রাজউকের নীতিনির্ধারণী ও সব পর্যায়ের নির্বাহী ক্ষমতা কার্যত বোর্ডের ওপর ন্যস্ত থাকায় বোর্ড সদস্যদের অধীন কর্মকর্তারা তাদের অধস্তন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথভাবে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারেন না। আবার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে রাজউক বোর্ডের কার্যক্রম কার্যকরভাবে তদারকি করা হয় না এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা প্রেষণে নিযুক্ত হওয়ায় অধস্তন পর্যায়ের প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে পারেন না– এমন অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া একই পদমর্যাদা সত্ত্বেও রাজউকের দুজন পরিচালককে আঞ্চলিক

কার্যালয়গুলোর পরিচালকদের কার্যক্রম তদারকির দায়িত্ব দেওয়ায় কার্যকর জবাবদিহি ব্যাহত হয়। রাজউকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যবস্থা থাকলেও শাস্তির যথাযথ প্রয়োগ না করার অভিযোগ রয়েছে। রাজউকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং নৈতিকতা কমিটির কার্যকারিতার ঘাটতি রয়েছে। এখন পর্যন্ত সততার চর্চায় সাফল্যের ক্ষেত্রে পুরস্কার ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি। এ ছাড়া গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক রাজউকের জবাবদিহি নিশ্চিত হওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে। কারণ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির দুজন সদস্যের ব্যক্তিগত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা স্পষ্টভাবে স্বার্থের সংঘাত।

রাজউকে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং কিছু শাখায় অভিযোগ নথিভুক্তি বা নিষ্পত্তি ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে। যেমন কেন্দ্রীয় এবং নগর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখায় অভিযোগ পৃথক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয় না; কিন্তু উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখায় রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে, অনেক ক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক বা ফোকাল পয়েন্ট কর্তৃক সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে অভিযোগ গণশুনানির জন্য জমা করা হয়। অধিকাংশ অভিযোগ এবং গণশুনানির বিষয় ইমারত নির্মাণ, প্লট ও ফ্ল্যাটসংক্রান্ত। রাজউকে এ পর্যন্ত দুই ধরনের গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিচে দুই ধরনের শুনানি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

রাজউক আয়োজিত গণশুনানি : ২০১৬ সাল থেকে রাজউকের গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বুধবার অভিযোগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে গণশুনানি হয়। গণশুনানি বলা হলেও এখানে অভিযোগকারী, তার সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাই শুধু অংশ নেন। গণমাধ্যম কিংবা জনগণের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয় না। অতএব এ ক্ষেত্রে গণশুনানির মূল উপাদান অনুপস্থিত। রাজউকের তথ্য মতে, গণশুনানির মাধ্যমে ২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত জমাকৃত মোট ৩৩৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এই শুনানিগুলোর মধ্যে মূলত নথিসংক্রান্ত কিছু সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। কিন্তু প্লট প্রাপ্তি বা হস্তান্তর সম্পর্কিত সমস্যা যেগুলোতে বেশি সময় লাগে, সেগুলোর ক্ষেত্রে সমাধান করতে পারেনি। এ ছাড়া প্রতারণার মাধ্যমে বিক্রয়কৃত প্লটের সমস্যার সমাধান তারা করতে পারেনি।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আয়োজিত গণশুনানি : ২০১৬ সালের জানুয়ারি ও ডিসেম্বর মাসে দুদক আয়োজিত দুটি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ১১১টি অভিযোগ গণশুনানির জন্য উত্থাপিত হয়। তার মধ্যে রাজউকের সেবা সম্পর্কিত ৩৩টি অভিযোগের ওপর শুনানি হয়। শুনানির বিষয়গুলোর মধ্যে ৮৪ দশমিক ৮ শতাংশ ছিল প্লটের বরাদ্দ ও দখল বুঝে না পাওয়াসংক্রান্ত। শুনানির বিষয়গুলোর মধ্যে চারটি বাতিল করা হয় এবং বাকি ২৯টি বিষয়ের ওপর গণশুনানির অভিযোগ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বাস্তবায়ন বা ফলোআপ সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য দুদকের কাছে নেই। পরে ৩৩টি অভিযোগের মধ্যে ১১টির ক্ষেত্রে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে জানা যায়, সেগুলোর মধ্যে ৯টির ক্ষেত্রে গণশুনানির সিদ্ধান্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়নি। আরও জানা যায়, দুদকে অভিযোগকারী সেবাগ্রহীতারা পুনরায় রাজউকে সেবার জন্য গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সেবা দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং অশোভন আচরণ করেন।

রাজউকের তদারকি কার্যক্রমে ঘাটতি রয়েছে। রাজউক কর্মকর্তারা মাঠপর্যায়ে যথাযথভাবে তদারকি না করলেও তাদের জবাবদিহির আওতায় না আনার অভিযোগ রয়েছে। ফলে তদারকির ঘাটতির ফলে সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে আইন ও বিধি লঙ্ঘনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়; বিশেষ করে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র সম্পর্কিত জরিপ, ইমারত নির্মাণ পরিদর্শন, কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্পের কার্যাদেশ দেওয়ার পর বাস্তবায়ন কার্যক্রম, অনুমোদনের পর বেসরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম এবং খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ও প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণে কার্যকর তদারকি নেই। ফলে প্রকল্পের নকশা পরিবর্তন হয়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন আইন ও বিধির লঙ্ঘন হয়। তদারকির ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ইমারতের মালিক প্রভাবশালী হলে বিধি লঙ্ঘন করার পরও সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক পরিদর্শন করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হলে পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করতে পারেন না। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করা হলেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে। আবার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ও প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কেউ যদি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত জায়গার শ্রেণি পরিবর্তন করতে চায়, তবে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে ব্যত্যয় লক্ষ করা যায়। তদারকির ঘাটতির ফলে অনুমোদন ছাড়াই খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান দখল এবং প্রাকৃতিক জলাধার ভরাট করার অভিযোগ রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে রাজউক উচ্ছেদ করার ক্ষমতা প্রযোগ করে না। তদারকির ঘাটতি ও শাস্তি প্রদান না করার একটি উদাহরণ হলো ২০০৮ সাল থেকে তুরাগ নদের তীরে ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সাভার এলাকায় জলাশয় ভরাট কার্যক্রম প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ এবং ড্যাপ ২০১০ লঙ্ঘন করলেও এসব ক্ষেত্রে কার্যকর তদারকির ঘাটতি এবং শাস্তি প্রয়োগ না করার বিষয়টি স্পষ্ট।

নিরীক্ষা সংক্রান্ত : মহাপরিদর্শক ও নিরীক্ষকের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে রাজউকের নিরীক্ষা কার্যক্রমের সময় রাজউকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করে ও রাজউক আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার প্রকল্প নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষা দল রাজউকের ইচ্ছা অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি বা প্রতিবেদনকে প্রভাবিত করতে প্রকল্প পরিচালকের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ গ্রহণ করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান না করলে প্রতিবেদনে বড় ধরনের সমস্যা লেখা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। নিরীক্ষা বাবদ আপ্যায়নের জন্য রাজউক বছরে ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা খরচ করে থাকে।

অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) বা বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন জনস্বার্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার কথা থাকলেও তা না করার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদেরও সর্বশেষ ড্যাপ রিভিউয়ের কাজে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত না করার অভিযোগ রয়েছে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প পরিকল্পনা বা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা সাধারণ জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণির মতামতের ভিত্তিতে করার কথা থাকলেও

প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় এলাকার সাধারণ জনগণের সঙ্গে আলোচনা না করে কেবল সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও প্রভাবশালীদের (রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী ইত্যাদি) মতামত গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে, প্রকল্পের প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দে কোটা নির্ধারণ এবং বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রহীতাদের আয়ের শ্রেণি এবং অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিত যেমন নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি বিবেচনায় নেওয়া হয় না; বরং এলিট বা প্রভাবশালীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। অর্থাৎ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিবেচনায় ফ্ল্যাটের দাম নির্ধারণ করা হয় না। আবার রাজউক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান না হলেও রাজউক নির্ধারিত ফ্ল্যাটের মূল্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ধার্যকৃত মূল্যের প্রায় সমান। রাজউক নির্ধারিত মূল্য উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পে প্রতি বর্গফুট ৪ হাজার ৮০০ টাকা এবং লালমাটিয়া প্রকল্পে ১০ হাজার টাকা এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের কর্তৃক ধার্যকৃত মূল্য উত্তরা ৫, ৭, ৯ থেকে ও ১৪ নম্বর সেক্টর ও দক্ষিণখানে ৪ হাজার থেকে ৭ হাজার ২০০ টাকা এবং লালমাটিয়ায় ৮ হাজার ৫০০ থেকে ১২ হাজার টাকা। এ ছাড়া প্রকল্পে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কম জমির মালিক থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের প্লট দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। মূলত প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট শর্ত দেওয়া হয়। যেমন পূর্বাচল প্রকল্পের ক্ষেত্রে শর্ত ছিল যাদের ১৬ শতাংশের কম জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তারা প্লট পাবেন না।

রাজউকে নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় ঘাটতি রয়েছে। কার্যালয়সমূহে শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা নেই। নারী কর্মীদের জন্য পৃথক টয়লেটের স্বল্পতা রয়েছে। আবার সেবাগ্রহীতা নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া রাজউক কার্যালয়সমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য র‍্যাম্পসহ প্রযোজ্য অন্যান্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই।

ছাড়পত্র অনুমোদনে অনিয়ম ও দুর্নীতি

অবৈধ চুক্তি, আত্মসাৎ ও নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় : অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাড়পত্র অনুমোদনে দালালের মাধ্যমে চুক্তি হয়ে থাকে। রাজউক কর্মকর্তা, দালাল ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের মাধ্যমে চুক্তি করে সুনির্দিষ্ট হারে নিয়মবহির্ভূত অর্থ নেওয়া হয়। চুক্তির অর্থের পরিমাণ বিভিন্ন নির্ধারকের ওপর নির্ভর করে। ছাড়পত্র অনুমোদনে ঘুষের পরিমাণের নির্ধারক হচ্ছে রাস্তার প্রস্থ, জমির পরিমাণ, জমির ব্যবহার, জমির অবস্থান বা এলাকা, সেবাগ্রহীতার ধরন (ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী), মালিকানার সংখ্যা এবং দালালের ধরন বা পর্যায়। এ ছাড়া সেবাগ্রহীতা অনেক সময় বহিরাগত দালালদের মাধ্যমে হয়রানি ও অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়ে থাকেন। এ কারণে সেবাগ্রহীতারা সাধারণত রাজউকের কর্মচারীর সঙ্গে চুক্তি করেন।

আবার জরিপের সময়ও চুক্তিভিত্তিক নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এর পরিমাণ ব্যক্তি ও রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার পর্যায়ে দুই হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত। অনেক সময় জরিপ পর্যায়ে রাস্তা প্রশস্ত দেখানো হয়। রাস্তা প্রশস্ত দেখানোর জন্য ব্যক্তিপর্যায়ে ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। এ পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রে এবং অনলাইন আবেদনের সময় যখন কার্যালয়ে এসে আবেদন করতে হয়, তখন চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এ

ক্ষেত্রে ছাড়পত্র অনুমোদনে ব্যক্তি পর্যায়ে ১৫ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার পর্যায়ে ১ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়।

ছাড়পত্র অনুমোদনে সময়ক্ষেপণ : নাগরিক সনদ ও বিধিমালায় ছাড়পত্র অনুমোদনের নির্ধারিত সময় যথাক্রম ১৫ ও ৩০ দিনের উল্লেখ থাকলেও সে সময়ে অনুমোদন না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু জনবলের ঘাটতি থাকায় এবং ভূমিসংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করতে অনেক সময় লাগে বলে তারা নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে অনুমোদন দিয়ে থাকে। এ ছাড়া অনেক সময় জমির মালিক জরিপের সময় উপস্থিত থাকেন না বলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাড়পত্র প্রদানে দেরি হয় বলে রাজউক কর্মকর্তাদের অভিমত। ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণত এক মাস থেকে দুই মাস পর্যন্ত সময় লাগে। তবে, নিয়মবহির্ভূত অর্থ না দিলে এ সময় আরও দীর্ঘায়িত হয়।

নকশা অনুমোদনে অনিয়ম ও দুর্নীতি

অবৈধ চুক্তি ও নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় : সেবাগ্রহীতারা ইমারত নকশা অনুমোদন সেবা গ্রহণে নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য হন। সাধারণত রাজউক কর্মকর্তা, দালাল ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের মাধ্যমে চুক্তি করে সুনির্দিষ্ট হারে নিয়মবহির্ভূত অর্থ নেওয়া হয়। দালালরা রাজউকের কর্মচারী বা বহিরাগত হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রাজউক কর্মকর্তা সরাসরি সেবাগ্রহীতার সঙ্গে চুক্তি করেন। চুক্তির অর্থের পরিমাণ বিভিন্ন নির্ধারকের ওপর নির্ভর করে। নকশা অনুমোদনে ঘুষের পরিমাণের নির্ধারক হচ্ছে জমির পরিমাণ, জমির অবস্থান বা এলাকা, জমির ব্যবহার, মালিকানার সংখ্যা, দালালের ধরন বা পর্যায়, উচ্চতার সীমা লঙ্ঘন, তলার সংখ্যা এবং জমির নথিতে ত্রুটি। ব্যক্তিপর্যায়ে দশতলা পর্যন্ত ইমারতের নকশা অনুমোদনে ফির অতিরিক্ত ৫০ হাজার থেকে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার পর্যায়ে ২ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়। আবার দশতলার ঊর্ধ্বের ইমারতের নকশা অনুমোদনে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার পর্যায়ে ফির অতিরিক্ত ১৫ লাখ থেকে ৪০ লাখ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়। বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্পের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার পর্যায়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পরিমাণ ১৫ লাখ থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত।

নকশা অনুমোদনে সময়ক্ষেপণ : নাগরিক সনদ ও বিধিমালা অনুয়ায়ী নকশা অনুমোদনের নির্ধারিত সময় যথাক্রম ২০ ও ৪৫ দিন হলেও সে অনুযায়ী অনুমোদন না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সাধারণত চার মাসে নকশা অনুমোদন হয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত সময় লেগেছে এমন অভিযোগও রয়েছে। তবে অর্থের পরিমাণ বেশি হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেও কাজ সম্পন্ন হয়। রাজউকের কর্মকর্তাদের পরিচিত স্থপতি বা নির্ধারিত ফার্মের (যাদের সঙ্গে যোগসাজশ আছে) মাধ্যমে নকশার কাজ করলে কম সময়ে নকশা অনুমোদন হয়। অন্যথায় দেরিতে নকশা অনুমোদনের অভিযোগ রয়েছে।

প্রতারণা ও হয়রানি : অনেক ক্ষেত্রে বহিরাগত দালালরা সেবাগ্রহীতাকে বারবার ঘুরিয়ে হয়রানি করে। তারা অর্থ আত্মসাৎ করে পালিয়ে যায় বা সেবাগ্রহীতার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। তখন সেবাগ্রহীতাকে আবার নতুন করে অন্য কোনো দালালের সঙ্গে চুক্তি

করতে হয়। এ ছাড়া প্রকৌশলী বা স্থপতির স্বাক্ষর নকল করে নকশা অনুমোদন করারও অভিযোগ রয়েছে। ফলে অনেক সময় ওই পেশাজীবী ভুক্তভোগী হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্থপতি জানতে পারেন তার স্বাক্ষর নকল করে নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। তখন তিনি আবেদন করেন এবং ব্যবস্থা নিতে বলেন। কিন্তু অভিযোগের পাঁচ বছর পরেও দোষী ব্যক্তির কোনো শাস্তি হয়নি।

পরিদর্শনে অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং অন্যান্য চ্যালেঞ্জ : ভবন নির্মাণের আগে, নির্মাণের সময় এবং পরে পরিদর্শন করার নিয়ম। ইমারত বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে অনুমোদিত নকশা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় কতদূর অনুসরণ করা হচ্ছে তা দেখার জন্য রাজউকের পক্ষ থেকে নির্মাণ কাজটি পরিদর্শন করার কথা। কিন্তু তার পরিবর্তে নির্মাণের সময় এবং পরে চুক্তিভিত্তিক নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। সাধারণত এর পরিমাণ পাঁচ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবার বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হলে পরিদর্শক বারবার পরিদর্শন করেন এবং এ ক্ষেত্রে ঘুষের পরিমাণও বেড়ে যায়। অন্যদিকে, ইমারতের মালিকানা প্রভাবশালী ব্যক্তির হলে অনেক ক্ষেত্রে বিধি লঙ্ঘন করার পরও সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক পরিদর্শন করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হন বলে পরিদর্শন কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ, গুলশান ও বনানীর একাধিক বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ পরিদর্শন করার ক্ষেত্রে পরিদর্শকরা বাধার সম্মুখীন হওয়ায় পরিদর্শন কার্যকরভাবে করতে পারেন না। এ ছাড়া এসব ক্ষেত্রে ইমারতের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না।

নকশা বাস্তবায়নে আইন ও বিধির লঙ্ঘন

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কাজের অংশ হিসেবে তদারকির মাধ্যমে ইমারত নির্মাণে আইন ও বিধির প্রয়োগ নিশ্চিত করার কথা থাকলেও কার্যকর তদারকি না করার ফলে ইমারত নির্মাণ আইন ও বিধির লঙ্ঘন হয়ে থাকে। নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন তদারকি না করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। আইন ও বিধির লঙ্ঘনের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজউকের ভূমিকায় ঘাটতি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ এলে তিনবার নোটিশ প্রদানের পর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে সেবাগ্রহীতাদের পক্ষ নিয়ে কর্মকর্তারা রাজউকের বিরুদ্ধে মামলা করার পরামর্শ দেন। এ ক্ষেত্রে যেসব আইন লঙ্ঘন করা হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সেটব্যাক রুল অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা না ছাড়া, উচ্চতার সীমা লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণ, কলাম ঠিক রেখে অন্যান্য অংশে বিচ্যুতি, অগ্নিনিরাপত্তাব্যবস্থা সম্পর্কিত নিয়ম লঙ্ঘন, পার্কিং স্পেস বিধি লঙ্ঘন, সিঁড়ির প্রশস্ততা কম রাখা, লিফটের অবস্থান নকশা অনুযায়ী না করা। আবার সেটব্যাক রুল অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা ছাড়া হয়েছে দেখিয়ে নকশা পাস করা হলেও পরে নির্মাণকাজ করার সময় জমির মালিক তা মেনে চলেন না। রাজউক অনুমোদিত নকশা লঙ্ঘন করে মেঝে এলাকা কমপক্ষে ১৫ শতাংশ বাড়িয়ে ইমারত নির্মাণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবাসিক ভবনে অনুমোদন ছাড়াই বাণিজ্যিক কার্যক্রম যেমন ব্যাংক, বিপণিবিতান, রেস্তোরাঁ, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি পরিচালনা করা হয়। আবার এসব ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসরণের নামে কিছু বেসরকারি সংস্থাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হয়রানি করার দৃষ্টান্তও রয়েছে।

অন্যদিকে এফআর টাওয়ার, আওয়াল সেন্টার, আহমেদ টাওয়ার, ওয়েস্টইন, জব্বার টাওয়ারসহ বিভিন্ন ভবনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না করা, অবৈধভাবে উচ্চতার সীমা লঙ্ঘন করা এবং সেটব্যাক রুল অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা না ছাড়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া রাজউক থেকে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করা হয় না। গত পাঁচ বছরে অনুমোদিত মোট নকশার ৪১৮টিতে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়েছে, যা ভবন নির্মাণের সংখ্যার তুলনায় নগণ্য।

প্রকল্প সম্পর্কিত সেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

ঢাকা মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনা (ডিএমডিপি) লঙ্ঘন ও সম্ভাব্যতা যাচাই না করা : ঢাকা মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনা (ডিএমডিপি) অনুযায়ী উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করার স্বার্থে রাজউক অথবা অন্য কোনো ডেভেলপার উপবন্যা প্রবাহ অঞ্চল বা বন্যা প্রবাহ অঞ্চলের কৃষি জমি আবাসিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু ডিএমডিপি লঙ্ঘন করে নির্ধারিত উপবন্যা প্রবাহ অঞ্চল বা বন্যা প্রবাহ অঞ্চলের কৃষি জমিতে রাজউক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যেমন ঝিলমিল প্রকল্প, পূর্বাচল প্রকল্প, কম্প্যাক্ট টাউনশিপ প্রকল্প ইত্যাদি। এ ছাড়া ড্যাপ পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশে বন্যা প্রবাহ বা উপবন্যা প্রবাহ অঞ্চলে পানির গতি রোধ না করা এবং পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হলেও পরবর্তীকালে রাজউক নিজেই অনেক বন্যা প্রবাহ অঞ্চল দখল করে সেখানে হাউজিং প্রকল্প হাতে নিয়েছে। অন্যদিকে, ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভাব্যতা (মৃত্তিকা পরীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ইত্যাদি) যাচাই না করে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন ঝিলমিল প্রকল্প, উত্তরা তৃতীয় পর্ব প্রকল্প ইত্যাদি। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে প্রতিবেদন প্রণয়ন না করে ধারণাসংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

প্রতারণা ও হয়রানি : প্রকল্প পরিকল্পনার শুরুতে ক্ষতিগ্রস্তদের তথ্যভান্ডার প্রস্তুত না করায় জমি অধিগ্রহণের আগে সরকারি কর্মকর্তা, তাদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রকল্প এলাকার পাশে বসবাসকারী ব্যবসায়ীরা অধিগ্রহণে কম মূল্য পাবেন এমন গুজব তৈরি করে স্থানীয়দের জমি ক্রয় ও ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক হিসেবে তালিকাভুক্ত হন বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রাজউকের প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের ছোট প্লট দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া প্লটের অবস্থান ও নকশা পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিকল্পনার অতিরিক্ত নতুন প্লট তৈরি এবং বিতরণ (পূর্বাচল প্রকল্পে পাঁচবার নকশা পরিবর্তন) করা হয় এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে প্লটের স্থান পরিবর্তন করা হয় এবং সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি করা হয়। অন্যদিকে, রাজউকের বিরুদ্ধে প্লট মালিকের ফাইল হারিয়ে ফেলার অভিযোগ রয়েছে। ২০১৯ সালে প্লট মালিকদের ৭০০টিরও বেশি ফাইল হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার কিছু ফাইল খুঁজে দিতে বা দেখার জন্য নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দালাল, নথিরক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা টাকার বিনিময়ে নাম ও ছবি পরিবর্তন করে অন্যের নামে জমি বিক্রি করে দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় : প্লট বরাদ্দ, প্লট হস্তান্তর, ফ্ল্যাটের চাবি হস্তান্তর, প্লটের মালিকের নথিভুক্তির জন্য বিভিন্ন পরিষেবা (লিজ দলিল, নামজারি, হেবা, বিক্রয় অনুমোদন ইত্যাদি)

দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয় (সারণি ২)। নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রভাব খাটিয়ে ঠিকাদাররা কার্যাদেশ মূল্য জেনে যায় যা কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ উন্মুক্ত দরপত্র ও কোটেশন পদ্ধতিতে কার্যাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং বিলের টাকা উত্তোলনের সময় ঠিকাদারদের বিল থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে (সারণি ২)।

সারণি ২ : প্রকল্প সম্পর্কিত সেবায় নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

সেবার ধরন	সেবার নির্ধারিত ফি (টাকা)	নিয়মবহির্ভূত অর্থ (টাকা/ শতকরা হার)
নথিরক্ষকের কাছ থেকে মালিক নিজে বা দালাল কর্তৃক প্লটের ফাইল দেখা	ফি নেই	৫,০০০ - ১০,০০০
প্রকল্পের আবাসিক ফ্ল্যাটের চাবি হস্তান্তর	ফি নেই	২,০০০ - ৫,০০০
লিজ দলিল	৩১,০০০ - ৬০,০০০	৫০,০০০ - ১,০০,০০০
নামজারি (প্লটপ্রতি)	১০,০০০ - ২৫,০০০	১০,০০০ - ৫০,০০০
হেবা (ফ্ল্যাটপ্রতি)	৭,০০০ - ১৫,০০০	৫০,০০০ - ৭৫,০০০
বিক্রয় অনুমোদন (ফ্ল্যাটপ্রতি)	২০০-৩০০ (প্রতি বর্গফুট)	১৮,০০০ - ৭৫,০০০
বিক্রয় অনুমোদন (প্লটপ্রতি)	৫০,০০০ - ২,২০,০০০ (প্রতি কাঠা)	৫০,০০০ - ১,০০,০০০
বিল উত্তোলন (উন্নয়নমূলক ক্রয়)	ফি নেই	কার্যাদেশ মূল্যের ২%

সময়ক্ষেপণ : নাগরিক সনদে প্লটসংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা (লিজ দলিল, নামজারি, হেবা, বিক্রয় অনুমোদন ইত্যাদি) দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু নিয়মবহির্ভূত অর্থ না দিলে প্লট হস্তান্তর, ফ্ল্যাটের চাবি হস্তান্তর, প্লটের মালিকের নথিভুক্তির জন্য বিভিন্ন পরিষেবা (লিজ দলিল, নামজারি, হেবা, বিক্রয় অনুমোদন ইত্যাদি) দেওয়ার ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ হয়ে থাকে। তবে সেবাগ্রহীতারা প্রভাব খাটিয়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে এসব সেবা দ্রুত পেয়ে থাকেন।

ড্যাপ পর্যালোচনা ও সংশোধনে প্রভাব বিস্তার : ড্যাপ পর্যালোচনায় রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এবং ড্যাপ রিভিউয়ের কাজ রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানকে দেওয়ার মাধ্যমে স্বার্থের সংঘাত ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে। ২০১০ সালে ড্যাপ অনুমোদিত

হওয়ার পর থেকে ২০১৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে মোট ১৫৮ বার সংশোধিত হয়েছে। ড্যাপ সংশোধনের মাধ্যমে ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করে ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের মাধ্যমে ডেভেলপার, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার অভিযোগ রয়েছে। প্রভাবশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপের ফলে ড্যাপ রিভিউয়ের মাধ্যমে ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করে এবং ছাড়পত্র বা অনাপত্তিপত্র ছাড়াই বন্যা ও উপবন্যা প্রবাহ এলাকায় বেসরকারি প্রকল্প অনুমোদনের অভিযোগ রয়েছে। যেমন জলসিঁড়ি প্রকল্প, বসুন্ধরা প্রকল্প ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে নিম্নভূমি ও প্রাকৃতিক জলাধার ভরাট করে জমির শ্রেণি পরিবর্তন করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্প অনুমোদনে পরিবেশগত ছাড়পত্রও নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ড্যাপ রিভিউয়ের কোনো নির্ধারিত সময়সীমা না থাকায় এবং নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থ রক্ষায় ড্যাপ ২০১৬-২০৩৫ চূড়ান্তকরণে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

রাজউকের সেবার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উভয় স্তরেই দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান। বর্তমানে রাজউকে নিয়ন্ত্রণমূলক কাজকে গুরুত্ব না দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজে অধিক গুরুত্বারোপ করা এবং আবাসন ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অন্যদিকে পরিকল্পনা প্রণয়ন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও তা বরাবর উপেক্ষিত থেকে গেছে।

রাজউকের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র, নকশা অনুমোদন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এসব সেবা ও এ-সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানে সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি এবং তাদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করা হয়। দুর্নীতির ক্ষেত্রে রাজউক কর্মকর্তা ও দালাল, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (যেমন প্রকৌশলী ও নকশাবিদ, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার ইত্যাদি) এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আঁতাত স্পষ্ট। ফলে রাজউক কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন ব্যাহত হচ্ছে।

এ ছাড়া ঢাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানিনিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা রোধ করে ঢাকাকে অধিক বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে ড্যাপ সংশোধনী কার্যক্রম পরিচালিত হলেও এ বিষয়গুলো গুরুত্ব না দেওয়া এবং এ ক্ষেত্রে সংবেদনশীল ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। রাজউক ক্ষমতার অপব্যবহার করে, ড্যাপ পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ উপেক্ষা করে বন্যা বা উপবন্যা প্রবাহ অঞ্চলে হাউজিং প্রকল্প গ্রহণ করলেও এ ব্যাপারে জবাবদিহি না থাকা, রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বারবার ড্যাপ সংশোধন এবং সংশোধন অব্যাহত থাকায় ড্যাপ চূড়ান্তকরণে দীর্ঘসূত্রতা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যা ও দুর্নীতির পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও জন-অংশগ্রহণের ঘাটতি, আইনি সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

সুপারিশমালা

আইনসংক্রান্ত

১. নগর উন্নয়ন (টাউন ইম্প্রুভমেন্ট) আইন, ১৯৫৩-এর আওতায়

- রাজউকের পরিচালনা পরিষদ সদস্যদের যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণের মাধ্যমে রাজউকের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি নিয়োগের বিধান প্রণয়ন করতে হবে।
- রাজউকের পরিচালনা পরিষদে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি রাখার বিধান রাখতে হবে।

২. ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২-এর আওতায়

- নকশা অনুমোদন ও বাস্তবায়নে নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তি ৫০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী সর্বনিম্ন ২ লাখ থেকে ৫০ লাখ টাকায় এবং অনাদায়ে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে উন্নীত করতে হবে।
- ইমারত ব্যবহারের আগে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট না নেওয়ার ক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করতে হবে।

৩. ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮-এর আওতায়

- নকশা পরিকল্পনা অনুমোদনে অগ্নিনিরাপত্তা নকশা এবং কাঠামোগত নকশা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- বহুতল ভবনের সংজ্ঞায়নে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে ছয়তলার ঊর্ধ্বে নির্মিত ইমারতকে বহুতল ভবন হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
- নির্মাণ নকশা, কাঠামো নকশা ও সেবাসংক্রান্ত নকশার পর্যাপ্ততা ও উপযুক্ততা যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী বা স্থপতির পাশাপাশি রাজউকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যুক্ত করতে হবে।
- ঐতিহাসিক, স্থাপতিক, পরিবেশগত কিংবা কৃত্তিগত নিদর্শনের পার্শ্ববর্তী বৃহদায়তন বা বিশেষ ইমারতের উচ্চতা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৪. ঢাকা উন্নয়ন ট্রাস্ট (ভূমি বরাদ্দ) বিধিমালা, ১৯৬৯-এর আওতায়

- প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তরা যেন ন্যায্যভাবে প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দ পান, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রাখতে হবে; এর পাশাপাশি প্রকল্প থেকে অর্জিত আয়ের একটি অংশ স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রদানের বিধান রাখতে হবে।
- প্রকল্পের প্লট প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির কোটা সম্পর্কিত নির্দেশনা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার পাশাপাশি ‘জাতীয় পর্যায়ে অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তির মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে;

৫. বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪-এর আওতায় প্লট বিতরণের কত সময়ের মধ্যে ইমারত নির্মাণের কাজ শুরু করতে হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত

৬. আইনের যথাযথ সংশোধন করে রাজউকের সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক, নিরপেক্ষ, পর্যাপ্ত ক্ষমতায়িত ও প্রভাবমুক্ত নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭. সেবা সহজীকরণে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে–

- রাজউকের কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ ও আঞ্চলিক অফিসগুলোতে সেবা সম্পর্কিত সব শাখা চালু করতে হবে।
- ইমারত নকশাসহ বিভিন্ন নথি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও ইমারত নির্মাণ নকশা অনুমোদনে অনলাইন আবেদন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত গাইডলাইন তৈরি করতে হবে।

৮. মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট কমিটির ড্যাপ রিভিউ কার্যক্রম বন্ধ করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ডিএমডিপির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে অবিলম্বে ড্যাপ চূড়ান্ত করতে হবে।

৯. বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় সংস্কার করে জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং রাজউকের স্থায়ী কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ তৈরি করতে হবে।

১০. ইমারত নকশা অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় সব নকশা (স্থাপত্য, নির্মাণ, কাঠামো ও সেবাসংক্রান্ত) সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করে পরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন করতে হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে এলাকাভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করতে হবে।

১১. কর্তৃত্ব বণ্টনসহ আর্থিক নির্দেশিকা এবং পুলের গাড়ি ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত

১২. সেবার মূল্য ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়া, অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক সব কার্যালয়ে উন্মুক্ত স্থানে নাগরিক সনদ প্রদর্শন করতে হবে।

১৩. ওয়েবসাইট আরও তথ্যবহুল করতে হবে (নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ বাজেট, প্লট বরাদ্দ ও ক্ষতিপূরণসংক্রান্ত তথ্য, কোটা নির্ধারণ ইত্যাদি) এবং তথ্যগুলো নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

জবাবদিহি বৃদ্ধিসংক্রান্ত

১৪. রাজউকের সেবা কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে এবং দালাল কর্তৃক হয়রানি বন্ধ করতে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৫. অভিযোগ নিষ্পত্তিতে করণীয়

- কেন্দ্রীয়ভাবে পৃথক অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল গঠন করতে হবে এবং অভিযোগ প্রদান ও নিরসন প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- অভিযোগ নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- অভিযোগ প্রদানের জন্য হটলাইন চালু করতে হবে।

১৬. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্তভাবে পুনর্গঠন করে রাজউকের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে কমিটিকে কার্যকর করতে হবে।

শুদ্ধাচারসংক্রান্ত

১৭. রাজউকের কর্মকর্তাদের বার্ষিক আয় ও সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

১৮. প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দৃষ্টান্তমূলক ও কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] *বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন ম্যাক্রোট্রেন্ডস, বাংলাদেশ পপুলেশন ১৯৫০-২০২০*, (ম্যাক্রোট্রেন্ডস, ২০১৯)। অনলাইন তথ্যসূত্র : https://www.macrotrends.net/countries/BGD/bangladesh/population (সর্বশেষ দেখা হয়েছে, ডিসেম্বর ৩১, ২০১৯)

[২] *বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন :* Transparency International Bangladesh, *Corruption in plan permission process in RAJUK: A study of violations and proposals*, (Dhaka: Transparency International Bangladesh, 2007). [online] Available at: https://www.ti-bangladesh.org/research/ES_Rajuk_Eng.pdf (সর্বশেষ দেখা হয়েছে, অক্টোবর ১৫, ২০১৯)

[৩] *বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন*, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, *বার্ষিক বাজেট ২০১৪-১৫, বার্ষিক বাজেট ২০১৫-১৬, বার্ষিক বাজেট ২০১৬-১৭, বার্ষিক বাজেট ২০১৭-১৮, (ঢাকা : রাজউক, ২০১৬-১৯)।* সারণিতে সরকারি অনুদানের হিসাব অন্তর্ভুক্ত নয়; রাজস্ব আয়ের অন্তর্ভুক্ত ইজারা জমির আয়, হেক্টরপ্রতি ইজারা, দোকান ও মার্কেট থেকে আয়, সেবার ফি, ভাড়া, অন্যান্য; মূলধন আয়ের অন্তর্ভুক্ত উন্নয়নমূলক কাজ থেকে প্রাপ্ত নতুন মূলধন।

নিমতলী, চুড়িহাট্টা এবং অতঃপর : পুরানো ঢাকার অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় *

মো. মোস্তফা কামাল ও আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া

গবেষণার প্রেক্ষাপট

আইন অনুযায়ী অগ্নিকাণ্ড একটি দুর্যোগ।[১] ঢাকা মহানগরে ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ছোট-বড় মিলিয়ে যথাক্রমে ২ হাজার ৩৯৭, ১ হাজার ৯৭৭ ও ২ হাজার ৯৫৩টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।[২] পুরানো ঢাকায় এ প্রবণতা আরও বেশি। ২০১৮ সালে পুরানো ঢাকার লালবাগ, হাজারীবাগ, সদরঘাট ও সিদ্দিকবাজার এলাকায় অন্তত ৪৬৮টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।[৩] পুরানো ঢাকার সাম্প্রতিক সময়ের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড অন্যতম। ২০১০ সালের ৩ জুন রাতে নিমতলীর ৪৩ নবাব কাটারার নিচতলায় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার থেকে সূত্রপাত হওয়া আগুন রাসায়নিক ও দাহ্যপদার্থের গুদামে ছড়িয়ে পড়লে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১২৪ জনের মৃত্যু হয় এবং কয়েক শ মানুষ আহত হন। ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে চকবাজারের চুড়িহাট্টার ওয়াহিদ ম্যানশনের রাসায়নিক ও দাহ্যপদার্থের গুদামের আগুনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৭০ জনের মৃত্যু ঘটে এবং কয়েক শ মানুষ আহত হন।

২০১০ সালে নিমতলী ট্র্যাজেডির পর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটি ১৭টি সুপারিশ করে। এর পাশাপাশি উচ্চ আদালত থেকেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। তবে এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন কতটুকু হয়েছে তা পর্যালোচনার আগেই চুড়িহাট্টার অগ্নিকাণ্ড ঘটে। গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে পুরানো ঢাকায় দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের প্রায় ১৫ হাজার গুদামের উপস্থিতি রয়েছে।[৪] অপ্রশস্ত ও অপরিকল্পিত অবকাঠামোর পাশাপাশি পুরানো ঢাকার জনসংখ্যার ঘনত্বও অগ্নিনিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের বিষয়।[৫]

সারণি ১ : ঢাকা শহরের জনসংখ্যার ঘনত্ব[৬]

ঢাকা মেট্রোপলিটন	থানার সংখ্যা	আকার (বর্গকিলোমিটার)	জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিলোমিটারে)
পুরানো ঢাকা	৭টি	১৪.৬৬	৯৪,৩৮০ জন
নতুন ঢাকা	৩৪টি	৩২৭.৫৭	৩৯,৮৫৭ জন

* ২০২০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের নয় বছর আগে ঘটে যাওয়া নিমতলী ঘটনার শিক্ষা কতটুকু কাজে লাগানো হয়েছে তা নিয়ে গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হয়। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ, যার একটি অভীষ্ট হচ্ছে দুর্যোগের কারণে নগরে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা ও দুর্যোগসহনশীল নগর নিশ্চিত করা (অভীষ্ট ১১)।[৭] পুরানো ঢাকাকে দুর্যোগসহনশীল নগর হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার উদ্দেশ্য পুরানো ঢাকায় অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় চিহ্নিত করা। অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অংশীজনদের দায়িত্ব, সক্ষমতা ও কার্যক্রম; বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত তদন্ত কমিটি ও আন্তমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে (সক্ষমতা, সমন্বয়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি) পুরানো ঢাকায় অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা হয়েছে এ গবেষণায়। পুরানো ঢাকার আটটি থানার মধ্যে অগ্নি-ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাগুলো এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণাপদ্ধতি ও বিশ্লেষণকাঠামো

এটি একটি গুণগত গবেষণা। গুণবাচক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও নথি পর্যালোচনা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিভিন্ন অংশীজন যেমন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, ঢাকা জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, নগর উন্নয়নবিদ, রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ, বাড়ির মালিক ও ভাড়াটে, দোকান মালিক ও কর্মচারী, মার্কেট মালিক ও সমিতির নেতা, রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম মালিক, প্লাস্টিক কারখানার কর্মচারী ইত্যাদির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট নথি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় অক্টোবর ২০১৯ থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সুশাসনের কয়েকটি নির্দেশক– সক্ষমতা, সমন্বয়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি অনুসারে গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ২ : পুরানো ঢাকার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট অংশীজন

সংশ্লিষ্ট অংশীজন	অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন	ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, অগি-ঝুঁকিসহ অন্যান্য সমস্যা চিহ্নিত করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ।
রাজউক	ইমারত তৈরির নকশা অনুমোদন, পরিদর্শন ও তদারকি, অকুপেন্সি সার্টিফিকেট প্রদান।
ঢাকা ওয়াসা	ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন ও পানি সরবরাহ।
শিল্প মন্ত্রণালয়	অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ এবং স্থায়ী রাসায়নিক পল্লি স্থাপন।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় কর্মসূচি গ্রহণ এবং দুর্ঘটনা-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন।
ঢাকা জেলা প্রশাসন	আবাসিক এলাকা থেকে কলকারখানা সরিয়ে দেওয়া।
কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর	কারখানা পরিদর্শন ও লাইসেন্স প্রদান; অতিঝুঁকিপূর্ণ কারখানা চিহ্নিতকরণ, সংস্কারের জন্য নোটিশ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ।
বিস্ফোরক অধিদপ্তর	বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ; রাসায়নিক পণ্য আমদানি, পরিবহন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা পরিদর্শন করে লাইসেন্স প্রদান।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	অগ্নি-প্রতিরোধ ও অগ্নিনির্বাপণ।
পরিবেশ অধিদপ্তর	কারখানা ও রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের গুদাম স্থাপনে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান।

গবেষণার ফলাফল

পুরানো ঢাকার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়, যা ১৭ দফা সুপারিশ পেশ করে। এসব সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পুরানো ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে জরুরি ভিত্তিতে রাসায়নিক ও দাহ্যপদার্থের গুদাম ও দোকান অপসারণ; আবাসিক এলাকায় সব ধরনের দাহ্যপদার্থের মজুত ও বিক্রি নিষিদ্ধ; সব ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা; অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০০৩ এবং বাংলাদেশ ইমারত নির্মাণ বিধির কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজধানীতে ভবন নির্মাণ ও স্বতন্ত্র ফায়ার হাইড্রেন্ট পয়েন্ট স্থাপন করা; রাসায়নিক ও দাহ্যপদার্থের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর

মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা; অবৈধ বা অননুমোদিত গুদামের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ; ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি; আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক ও দাহ্যপদার্থের মজুত ও বিক্রি বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি; বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্মুক্ত লাইনের ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি, নিয়মিতভাবে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার পরীক্ষা করা; এবং সব কমিউনিটি সেন্টারে নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

এর পাশাপাশি মহামান্য হাইকোর্ট একটি আদেশ জারি করেন। আদেশটির উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো একটি তদন্ত কমিটি গঠন ও অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল; গঠিত টাস্কফোর্সের মাধ্যমে ঢাকার অননুমোদিত ভবন নির্মাণ, রাসায়নিক, বিস্ফোরক ও দাহ্যপদার্থের গুদাম চিহ্নিত করে প্রতিবেদন পেশ; প্রয়োজনীয় স্থানে অগ্নিনির্বাপণের জন্য ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপনে কত সময় প্রয়োজন সে-সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ; অগ্নিনির্বাপণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংবাদ প্রচারমাধ্যমে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার প্রতিবেদন তিন মাসের মধ্যে প্রদান, ছয় মাসের মধ্যে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র স্থাপন এবং অগ্নিকাণ্ডের সময় জরুরি বহির্গমন পথ নিশ্চিত করার প্রতিবেদন প্রদান করা।

পুরানো ঢাকার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ২০১১ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন আবাসিক এলাকা থেকে অননুমোদিত গুদাম বা কারখানা অপসারণের লক্ষ্যে রাসায়নিক পল্লির জন্য স্থান নির্ধারণ ও আন্তমন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল কমিটি গঠন। এই কমিটি সুপারিশসহ প্রতিবেদন পেশ করে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গুদাম বা কারখানা অপসারণের জন্য শ্যামপুর, টঙ্গী ও মুন্সীগঞ্জে স্থান নির্ধারণ করা হয়– শ্যামপুরে বর্তমানে কাজ চলছে। এ ছাড়া ফায়ার সার্ভিস পুরানো ঢাকার ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মার্কেট, আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদির পাশাপাশি প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জলাধার চিহ্নিত করেছে। ফায়ার সার্ভিস, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিস্ফোরক অধিদপ্তরের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি এখনো চলমান। বিস্ফোরক অধিদপ্তর দাহ্যপদার্থের তালিকা তৈরি করছে। কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান প্রক্রিয়া অংশ ৪ হাজার ৯টি ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬০০টির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। বিস্ফোরক অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, কলকারখানা অধিদপ্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন পুরানো ঢাকায় কারখানা স্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রদান বন্ধ রেখেছে। চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর টাস্কফোর্স পুরানো ঢাকার ঝুঁকিপূর্ণ ১০০টির অধিক কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে।

অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

সক্ষমতা

আইনিকাঠামো পর্যালোচনা : ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী বহুতল ভবনে অগ্নিনিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বহুতল ভবনের সীমা দশতলা বা ৩৩ মিটারের উর্ধ্বে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] ফলে দশতলার

কম উচ্চতার ইমারত অগ্নিনিরাপত্তার বাইরে রয়েছে। এ ছাড়া ইমারতের নকশা অনুমোদনের আবেদনে কেবল স্থাপত্য নকশা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। এ ক্ষেত্রে অগ্নিনিরাপত্তা ও কাঠামোগত নকশা জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বিদ্যমান। এই আইনে ভবন নির্মাণ ও এর বৈধ ব্যবহার নিশ্চিতে রাজউক কর্তৃক তদারকি বা পরিদর্শনের নির্দেশনা না থাকায় দায়িত্বে অবহেলার কারণে রাজউক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮; অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, ২০০৬-এ ভিন্ন ভিন্ন সীমার ভবনকে 'বহুতল ভবন' হিসেবে গণ্য করার কারণে অগ্নিনিরাপত্তার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে দায় এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান।[৯] এ ছাড়া অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এবং বিধিমালা, ২০০৪-এ অ্যাসিড পরিবহনের জন্য বিশেষায়িত যানবাহন ব্যবহারের বাধ্যবাধকতার উল্লেখ না থাকার ফলে অ্যাসিড ব্যবসায়ীরা যেকোনো যানে করে অ্যাসিড বহন করেন, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়।

শ্রম আইন, ২০০৬-এ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের শিকার হলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যথাক্রমে ২ লাখ ও ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ক্ষতিপূরণ হিসাবে অপর্যাপ্ত। শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সরাসরি আইন প্রয়োগের সুযোগ নেই। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে, এই আইনে প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের শিকার হলে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের কোনো দিকনির্দেশনা নেই। কোনো মানদণ্ড অনুসৃত হয় না বলে অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আবার, কোনো অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু ও পঙ্গুত্ববরণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি সম্পর্কে বিদ্যমান আইনে কোনো উল্লেখ নেই। ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এ গুদাম বা কারখানার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকলে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া এখতিয়ার আইনে দেওয়া নেই, ফলে অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়। এ ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেশগত দূষণ বন্ধে তাৎক্ষণিক বা দ্রুত কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি আইনে সুস্পষ্ট করা হয়নি। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ ও দূষণ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায়।

নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক দাহ্য রাসায়নিক ও দাহ্য রাসায়নিক সম্পৃক্ত দ্রব্যের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে আশপাশের হোল্ডিং মালিকদের অনাপত্তিপত্র, ফায়ার সার্ভিস ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, কারখানা লিমিটেড হলে ইন-করপোরেট সার্টিফিকেট, বিধিবিধান মেনে চলার ব্যাপারে অঙ্গীকারনামা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়, যা বিধিবিধানে এখনো অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে ঝুঁকি অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে, কোনো প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ে একটি 'ইউনিক অথরিটি'

গঠনের প্রস্তাব এখনো বাস্তবায়ন না হওয়ায় সমন্বয়হীনতা অব্যাহত রয়েছে। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গুদামজাত করা, পাইকারি, খুচরা ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য কী পরিমাণ দাহ্য রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ করা যাবে, সে-সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এখনো প্রণীত না হওয়ায় রাসায়নিক দ্রব্যের যথেচ্ছ ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উঁচু ভবন থেকে উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন, সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু পুরানো ঢাকায় প্রশস্ত রাস্তাঘাট, জলাধার ও ফায়ার হাইড্রেন্টের অভাবে এই সক্ষমতা কাজে লাগানো দুরূহ।

তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে অংশীজনের সক্ষমতার ঘাটতি : নিমতলী ট্র্যাজেডির পর ৬ জুন ২০১০ আন্তমন্ত্রণালয় দুর্যোগ সমন্বয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অননুমোদিত রাসায়নিক কারখানা বা গুদাম অপসারণের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী ২০ এপ্রিল ২০১১ দুটি কমিটি গঠন করা হয়, যার একটি রাসায়নিক পল্লির জন্য স্থান নির্ধারণ কমিটি এবং অন্যটি আন্তমন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল কমিটি। সম্প্রতি দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯-এ অগ্নিকাণ্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। মূলত তদন্ত কমিটি কর্তৃক টাস্কফোর্স গঠনের এই সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর সব কমিউনিটি সেন্টারে নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলেও এখনো তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। স্বতন্ত্র ফায়ার হাইড্রেন্ট পয়েন্ট স্থাপন করার সুপারিশও করা হয়েছিল। গুরুত্ব না দেওয়া ও পরিকল্পনাহীনতার কারণে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক স্বতন্ত্র ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা হয়নি।[১০]

অগ্নি-প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০০৩ এবং বাংলাদেশ ইমারত নির্মাণবিধির কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজধানীতে ভবন নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী রাজউক দশতলার ঊর্ধ্বসীমার ভবন জরিপ করে ফায়ার এক্সিট ও হাইড্রেন্ট নেই বা ফায়ার এক্সিটে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন ভবনে তিন মাসের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দিয়েছিল। কিন্তু রাজউকের নোটিশ অনুসারে ভবনমালিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না, সে বিষয়ে ফলোআপ, আইন প্রয়োগে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে।

বিস্ফোরক অধিদপ্তরের মতে, এক হাজারের ওপর পেট্রোলিয়াম ও দাহ্যপদার্থ থাকলেও পুরানো ঢাকায় কোন রাসায়নিক পদার্থ কী পরিমাণে আছে, সে বিষয়ে তাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। অবৈধ বা অননুমোদিত গুদামের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হলেও এগুলো চিহ্নিত করে উল্লেখযোগ্য কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে নিয়মিত ও পরিকল্পিত তদারকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। শুধু বিশেষ চাহিদাভিত্তিক বা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে অভিযান পরিচালনা করা হয়, যা পুরোপুরি অনিয়মিত ও অপরিকল্পিত।

বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্মুক্ত লাইনের ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি এবং নিয়মিতভাবে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার পরীক্ষা করার একটি সুপারিশ থাকলেও বৈদ্যুতিক গোলযোগ হলেই কেবল পরীক্ষা করা হয়। নিয়মিত ও পরিকল্পিতভাবে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে।

জনবল ও বাজেট ঘাটতি : পরিবেশ আদালত পরিচালনার জন্য লোকবল ও বাজেটের স্বল্পতা রয়েছে। ঢাকা শহরের জন্য ছয়জন কর্মী ও পরিবহনের জন্য একটি গাড়ি রয়েছে। ফলে যথাসময়ে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া সম্ভব হয় না এবং মামলায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়। অন্যদিকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৯৯০ সালের অর্গানোগ্রাম অনুসারে যত লোক থাকার কথা ২০১৯ সালে তা থেকে আরও কমানো হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সংস্থাটির নগর পরিকল্পনা ও রাজস্ব বিভাগে জনবল হ্রাস করা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২ হাজার ৪২২টি পদের বিপরীতে ৬৮৪টি (২৮ দশমিক ৩ শতাংশ) পদ বর্তমানে শূন্য।[১১] রাজউক, কলকারখানা অধিদপ্তর ও বিস্ফোরক অধিদপ্তরেও পরিদর্শকের ঘাটতি রয়েছে। সম্প্রতি দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯-এ অগ্নিকাণ্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় কোনো কর্মসূচি বা বাজেট বরাদ্দ করা হয়নি।

সমন্বয়

তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি : অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগের ঘাটতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[১২] এর ফলে পুরানো ঢাকা সরু রাস্তা ও অলিগলি-অধ্যুষিত এলাকা, ফায়ার হাইড্রেন্ট ও জলাধারের অভাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বর্ধিত সক্ষমতা কাজে লাগানো দুরূহ। রাজউকের পক্ষ থেকে তদারকির ঘাটতি এবং রাস্তা প্রশস্তকরণে সিটি করপোরেশনের সমন্বিত উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ব্যাপক হলেও প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ প্রেরণ ও দীর্ঘ বিরতিতে সভা আয়োজনের মধ্যে তার কাজ ও সমন্বয়মূলক কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রেখেছে। আবার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য ব্যবস্থাপনার ঘাটতি ছিল লক্ষণীয়।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি ও সংস্থার ভিন্ন ভিন্ন সুপারিশের ফলে রাসায়নিক পল্লির জন্য স্থান নির্ধারণে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়। রাসায়নিক পল্লির জন্য স্থান নির্ধারণ কমিটি ১৬ আগস্ট ২০১১ প্রতিবেদন প্রদান করে এবং কেরানীগঞ্জের সোনাকান্দায় স্থান নির্ধারণের সুপারিশ করে। প্রায় পাঁচ বছর পর ১১ জানুয়ারি ২০১৬ শিল্প মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদনের জন্য তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে। এর ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশনের সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি কেরানীগঞ্জের ব্রাহ্মণকৃত্তায় পল্লি স্থাপনের সুপারিশ করে এবং সে অনুযায়ী পুনরায় ডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। ৩০ অক্টোবর ২০১৮ অর্থাৎ রাসায়নিক পল্লির জন্য স্থান নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ প্রদানের সাত বছর পর একনেক ২০১ দশমিক ৮১ কোটি টাকার

প্রকল্প অনুমোদন করে, যার বাস্তবায়নের সময়কাল ছিল জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০। আবার জমি অধিগ্রহণের সময় চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড ঘটলে কম জনবহুল এলাকায় পল্লি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী 'বিসিক রাসায়নিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পল্লি, মুন্সীগঞ্জ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং তা ৩০ এপ্রিল ২০১৯ একনেকে অনুমোদন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ বলে স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা হিসেবে শ্যামপুর ও টঙ্গীতে দুটি অস্থায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির অধীনে তিনটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটিগুলো বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন পেশ করলেও তা গুরুত্বের সঙ্গে না দেখে দীর্ঘদিন ফেলে রাখা হয়।

ঢাকা ওয়াসা ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপনের জন্য, জেলা প্রশাসন ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় রাসায়নিক পদার্থের ব্যবসায় স্থানান্তরের জন্য জায়গা প্রস্তুতির দায়িত্বপ্রাপ্ত। ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় সিটি করপোরেশন তাদের অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।[১৩]

লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। লাইসেন্সবিহীন দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের ব্যবসায় সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেওয়ার এখতিয়ার শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেই। আবার এসব প্রতিষ্ঠানকে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসা করা, কারখানা ও গুদাম স্থাপনের অনুমতি প্রদানের কর্তৃপক্ষ একাধিক। লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাইসেন্সের আওতায় আনার কোনো সমন্বিত উদ্যোগ বা পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে নেই। এর ফলে তাদের তৈরি অস্থায়ী গুদাম ও স্থায়ী রাসায়নিক পল্লিতে লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানকে স্থানান্তর করা যাচ্ছে না।

আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্যামপুরে অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য নির্মিত গুদামে ইটিপি স্থাপন না করে পরিকল্পনা ও কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া। অন্যদিকে টঙ্গীতে অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গৃহীত প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সুপারিশ উপেক্ষা করে এবং পরিবেশ আইন অমান্য করে পুকুর ভরাটের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজউক কর্তৃক অবৈধ বা অননুমোদিত ভবনের সেবা সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হলেও কোনো কোনো সময় এসব ভবনের সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় না বা সেবা সংযোগ বন্ধ করা হলেও অবৈধভাবে এই সব ভবনে পুনঃসংযোগ দেওয়া হয়। বিস্ফোরক অধিদপ্তর রাসায়নিকের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করলেও তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণ দেখা যায়নি।

স্বচ্ছতা

ক্ষতিপূরণ প্রদানে স্বচ্ছতার ঘাটতি : চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার কোনো ধরনের বা পরিমাণের ক্ষতিপূরণ কেন পেয়েছেন বা পাননি, সে সম্পর্কে অবগত নন। এপ্রিল ২০২০-

এ শ্রম অধিদপ্তর চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৭০ জনের মধ্যে ২৮ জন নিহতের পরিবারকে দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। যেসব নিহতের পরিবার এই অধিদপ্তর থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ পাননি, তারা যোগাযোগ করলেও কেন এই ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি বা আদৌ পাবেন কি না, সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য জানানো হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলেও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে একই পরিমাণ বা ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা বা একই ধরনের ক্ষতির শিকার পরিবারকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিপূরণের উদাহরণ রয়েছে। যেমন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃক চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে নিহতের পরিবার, আহত ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন চারটি পরিবারকে দুই লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে, আবার অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সিটি করপোরেশনের বর্জ্য বিভাগে চাকরি অথবা দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি : লাইসেন্স ছাড়া কতগুলো রাসায়নিক গুদাম, কারখানা ও দোকান পরিচালিত হয় সে হিসাব সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে নেই। যারা নিজ উদ্যোগে লাইসেন্স নেয় কর্তৃপক্ষ শুধু তাদের সম্পর্কে ধারণা রাখে। পুরানো ঢাকার স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকায় অবস্থিত রাসায়নিকের গুদাম, কারখানা ও দোকানের বৈধতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে জানতে চাইলেও তথ্য দেওয়া হয় না। অন্যদিকে, রাসায়নিক আমদানিতে ট্যাক্স-ভ্যাট ফাঁকি দিতে সঠিক হিসাব উল্লেখ করা হয় না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশে এসব করা হয়। ফলে কী পরিমাণ রাসায়নিক আমদানি করা হয়, সে সম্পর্কে পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় না।

জবাবদিহি

ভবনের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার রোধে তদারকির ঘাটতি : বন্ধ করে দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা পুনরায় চালু করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে টাস্কফোর্সের ফলোআপে ঘাটতি দেখা গেছে। ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ব্যবহারের তদারকিতে রাজউকেরও দায়িত্বে অবহেলা রয়েছে। একই ভবন আবাসিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অংশের বেশির ভাগেই দাহ্যপদার্থের গুদাম ও বিভিন্ন পণ্য তৈরির কারখানা থাকলেও রাজউক গঠনের আগে নির্মিত ভবন ও এর ব্যবহারের বিষয়ে তাদের দায়িত্ব নেই বলে দাবি করে, আবার অনুমোদিত ভবন কী কাজে ব্যবহৃত হয় রাজউক তা পরিদর্শন করে না।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিব্যবস্থায় ঘাটতি : সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ই-মেইল, ফোন ও ডাকযোগে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তাহীনতার কারণে স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে অবৈধ বা ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বা গুদাম নিয়ে অভিযোগ জানানো হয় না। অন্যদিকে চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো সরকারের কাছে ২০১৯ সালের ১৫ মে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি করলেও তা এখনো নিষ্পত্তি হয়নি।

জবাবদিহির ঘাটতি : নিমতলী ট্র্যাজেডির পর গঠিত তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্সের সুপারিশের বেশির ভাগ বাস্তবায়িত হয়নি। তদন্ত কমিটির ১৭টি সুপারিশের মধ্যে ৮টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে; ৯টি সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। টাস্কফোর্সের চারটি সুপারিশের মধ্যে একটি আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে; তিনটি সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা ছিল না। এর ফলে এসব সুপারিশ কেন সম্পূর্ণ হয়নি, সে সম্পর্কে জবাবদিহি করা যায়নি বা যেসব প্রতিষ্ঠানের কাজের আওতায় এসব সুপারিশ ছিল, তাদেরও জবাবদিহির কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

সারণি ৩ : নিমতলী ট্র্যাজেডির পর তদন্ত কমিটি প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

সুপারিশ	বাস্তবায়নের অগ্রগতি	সুপারিশ	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
আবাসিক এলাকা থেকে গুদাম বা কারখানা সরানো	বাস্তবায়ন হয়নি	১০. ট্রান্সফরমার সরেজমিনে পরীক্ষা করা	বাস্তবায়ন হয়নি
অনুমোদনহীন কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	আংশিক বাস্তবায়ন	১১. দুর্ঘটনা মোকাবিলায় জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন	বাস্তবায়ন হয়নি
আইন ও বিল্ডিং কোড অনুযায়ী ভবন নির্মাণ	আংশিক বাস্তবায়ন	১২. বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়	আংশিক বাস্তবায়ন
লাইসেন্স প্রদানে তদারকি বৃদ্ধি	আংশিক বাস্তবায়ন	১৩. ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বাড়ানো	আংশিক বাস্তবায়ন
জনমত তৈরি	আংশিক বাস্তবায়ন	১৪. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি	আংশিক বাস্তবায়ন
স্থানীয়ভাবে হাইড্রেন্ট পয়েন্ট স্থাপন	বাস্তবায়ন হয়নি	১৫. পাঠ্যসূচিতে অগ্নিকাণ্ড, উদ্ধার ও চিকিৎসার বিষয় বাধ্যতামূলক করা	আংশিক বাস্তবায়ন
আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক মজুত বা বিক্রি নিষিদ্ধ করা	বাস্তবায়ন হয়নি	১৬. ৬২ হাজার কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা	বাস্তবায়ন হয়নি
বৈদ্যুতিক তারের গুণগত মান নিশ্চিত করা	বাস্তবায়ন হয়নি	১৭. কমিউনিটি সেন্টারে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখা	বাস্তবায়ন হয়নি
খোলা তারের ব্যাপারে সাবধানতা তৈরি	বাস্তবায়ন হয়নি	-	-

টাস্কফোর্সের অধীনে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতি এবং মূল সমন্বয়কারীর ভূমিকা শিল্প মন্ত্রণালয়ের থাকলেও শিল্প মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক সুপারিশ বাস্তবায়ন কেন সম্পূর্ণ হয়নি, সে সম্পর্কে জবাবদিহির কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

অগ্নি-দুর্ঘটনা রোধ ও নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট দপ্তর তাদের কাজের পরিধি ও সীমাবদ্ধতার অজুহাতে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এ বিষয়ে তাদেরও জবাবদিহির আওতায় নেওয়া হয় না।

বিচারহীনতা ও আদালতের আদেশ পালন না করা : নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী অবৈধ গুদাম, কারখানা ও ভবনমালিকদের জবাবদিহির আওতায় আনা হয়নি। ২০১০ সালে কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা উচ্চ আদালতে জনস্বার্থে একটি মামলা করে এবং ২০১৯ সালে চকবাজার থানায় একজন নিহতের সন্তান ভবন, গুদাম মালিকসহ ১২ জনকে দায়ী করে একটি মামলা করেন। চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী ওয়াহিদ ম্যানশনের মালিকদ্বয় জামিনে মুক্ত হয়ে জেলের বাইরে আছেন। নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী অবৈধ গুদাম বা কারখানার মালিকদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর উচ্চ আদালত পুরানো ঢাকার রাসায়নিকের গুদামগুলো কেন সরিয়ে ফেলা হবে না, সে মর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করলেও দীর্ঘ দশ বছরে সরকার কর্তৃক আদালতে কোনো জবাব দাখিল করা হয়নি, যা আদালত অবমাননার শামিল। এ ছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা করলেও স্থানীয় থানা আসামিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে গাফিলতি করে বলে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো সময় দুর্নীতির মাধ্যমে আসামিদের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদন পেশ করা হয়। ফলে মামলা থেকে আসামিদের নাম খারিজের জন্য আবেদন করতে হয়।

অংশগ্রহণ

পরিকল্পনা গ্রহণ ও সুপারিশ বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততার ঘাটতি : পুরানো ঢাকা থেকে রাসায়নিক ব্যবসা, গুদাম ও কারখানা সরাতে ব্যবসায়ীদের অনীহা লক্ষণীয়। তাদের ধারণা, অন্য জায়গায় ব্যবসা সুবিধাজনক হবে না। দাহ্যপদার্থের গুদাম, কারখানা ও দোকান সরানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মালিক-কর্মচারী ও মহল্লার নেতাদের মিছিল-সমাবেশ করতে দেখা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই জনবহুল কেরানীগঞ্জ এলাকায় রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম সরানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলে জমি অধিগ্রহণের সময় বাধার সম্মুখীন হয়ে রাসায়নিক পল্লি স্থাপনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হতে হয়।

ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে জন অংশগ্রহণের ঘাটতি : সংশ্লিষ্ট অংশীজন অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও অধিকাংশ বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের প্রস্তুতি যেমন আগুন নেভানোর যন্ত্রপাতি, বালি, পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা নেই। আবার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে মার্কেট ও দোকানে

বালি, পানি ও ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখার পরামর্শ প্রদান করা হলেও অনেক সময় তা রাখা হয় না বা সেগুলো রাখার জন্য জায়গা অপ্রতুল।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর ট্রেড লাইসেন্সসহ কারখানা ও রাসায়নিক গুদাম স্থাপনের জন্য প্রযোজ্য লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন বন্ধ থাকলেও অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে এবং রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে লাইসেন্স বের করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিটি করপোরেশনের অসাধু কর্মকর্তাদের পরামর্শে ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম থেকে রাসায়নিক শব্দটি বাদ দিয়ে এন্টারপ্রাইজ হিসেবে ট্রেড লাইসেন্স বের করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাইসেন্স বের করা কঠিন হয়ে পড়লে রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব ব্যবহার করা হয়। আবার রাসায়নিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত না হয়েও কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা নিজেদের নামে লাইসেন্স বের করে ব্যবসায়ীদের প্রদান করেন। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাসিডের লাইসেন্স বের করা কঠিন বলে অ্যাসিড আমদানিতে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করা হয়। আবার নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়েও লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন অব্যাহত রয়েছে।

সারণি ৪ : নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্থের পরিমাণ (টাকা)
পরিবেশ অধিদপ্তর	২০,০০০-৩০,০০০
বিস্ফোরক অধিদপ্তর	১,৫০,০০০-২,৫০,০০০
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	৩,০০০-১২,০০০
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন	১,৫০০-১৮,০০০

দাহ্যপদার্থ পরিবহন করে গুদাম পর্যন্ত নেওয়া হয় অনেকটা প্রকাশ্যেই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা চেক করে অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। টহলরত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা গাড়িপ্রতি তিন শ টাকা করে চাঁদা নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

সুপারিশ বাস্তবায়নে নিয়ম অনুসরণে ঘাটতি : টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ (গুদামের সামনের রাস্তা ৬-৯ মিটার প্রশস্ত, বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে পাঁচ মিটার দূরে গুদামের অবস্থান, আবাসিক এলাকা ও ভবন বা বহুতল ভবনে রাসায়নিক মজুতের লাইসেন্স না দেওয়ার আদেশ) কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কমিটির প্রতিটি সুপারিশকে অবজ্ঞা করে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে গুদাম ও কারখানার কার্যক্রম পরিচালনা ও স্থাপন অব্যাহত রয়েছে।

পুরানো ঢাকায় আবাসিক বা বহুতল ভবনে, বিশেষ করে নিচতলায় রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম ভাড়া দেওয়া ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে। অবৈধ বা অননুমোদিত গুদাম চিহ্নিত করে কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এসব রাসায়নিক গুদাম বা কারখানায় মাঝেমধ্যে পুলিশি তল্লাশি চলে। ব্যবসায়ীদের মতে, মালামাল বাইরে থাকলে পুলিশ তাদের হয়রানি ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের জন্য এসব করে। এই নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরাও লাভবান হন, কারণ এর মাধ্যমে তারা নিয়ম ভঙ্গ করে ব্যবসা অব্যাহত রাখতে পারেন।

শিল্প-কারখানায় বিদ্যুতের লোড অনুযায়ী অনুমোদিত কোম্পানি বা ঠিকাদার দিয়ে ওয়্যারিং করানো এবং বিদ্যুৎ বিভাগের ছাড়পত্র নেওয়ার কথা। কিন্তু আবাসিক ভবনেই কারখানা স্থাপন করা হয় বলে সেগুলো লোড নিতে সক্ষম হয় না। ফলে শর্টসার্কিট বা ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণ হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে এসব যাচাই না করেই ছাড়পত্র দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

রাজনৈতিক প্রভাব : স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধিরা কারখানা ও গুদামের মালিক বা এসব ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়া এই ব্যবসার সুবিধাভোগী হিসেবে রয়েছেন কিছু কিছু বাড়ির মালিক, ব্যবসায়িক সমিতি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একাংশ এবং অনেক বড় বড় কোম্পানি, যারা পুরানো ঢাকা থেকে প্লাস্টিক পণ্য, কাঁচামাল ইত্যাদি নিয়ে ব্যবসা করেন। তাদের পক্ষ থেকেও বাধা তৈরি হয়। অনেক মার্কেটের মালিক রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের মার্কেটে থাকা রাসায়নিক গুদাম সরাতে কোনো কর্তৃপক্ষই সাহস পায় না। একজন প্রিন্টিং প্রেসের মালিকের ভাষ্যমতে, ‘পুরো চকবাজার সিন্ডিকেটের অধীনে আছে। তাই এখানে মোবাইল কোর্ট এলে তারা এমপির শেল্টার পায়। আগুন লাগার ব্যাপারে এখানে কেউ কথা বলতে চাইবে না। কারণ রাজনৈতিক বিপদ আছে।’

চুড়িহাট্টায় আগুন লাগার পর গঠিত টাস্কফোর্স কর্তৃক গুদাম বা কারখানা চিহ্নিত করে বন্ধ করে দিতে চাইলে ব্যবসায়ীরা প্রধানমন্ত্রী ও মেয়রের কাছে অভিযোগ করেন। পরে এই টাস্কফোর্সের কার্যক্রম স্থিমিত হয়ে পড়ে। লাইসেন্সবিহীন ও অবৈধ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের উপস্থিতির প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিতকরণ ও তা বন্ধ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া কোনো ঘোষণা ছাড়াই স্থগিত করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক দীর্ঘসূত্রতা : পুরানো ঢাকার একই ভবন আবাসিক ও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। যেসব ভবন বাণিজ্যিক ব্যবহার হয় তার বেশির ভাগ অংশেই দাহ্যপদার্থের গুদাম ও বিভিন্ন পণ্য তৈরির কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা বা স্থাপনার অবৈধ ব্যবহার বন্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে রাজউককে তাদের ভাষায় উচ্চতর কর্তৃপক্ষের ‘যথাযথ’ নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

উপসংহার

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো নির্দেশকের ক্ষেত্রেই সুশাসনের ঘাটতি ছিল, যার কারণে পুরানো ঢাকায় নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা প্রতিপালন না করার পাশাপাশি আদালতের অবমাননাও করেছে। পুরানো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির কারণে বাস্তবের মুখ দেখতে ব্যর্থ। কতিপয় প্রভাবশালীর অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে রাসায়নিক ও দাহ্যপদার্থের গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখা হয়েছে। দ্রুত অগ্নিনির্বাপণের জন্য পুরানো ঢাকায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ ছাড়া অগ্নি-দুর্ঘটনাকে দুর্যোগ হিসেবে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, যার প্রমাণ হচ্ছে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় বাজেট ও পরিকল্পনাও নেই। একই প্রবণতার কারণে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানকেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো নীতিমালা এখন পর্যন্ত তৈরি করা হয়নি এবং অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্যতার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার প্রবণতাও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ের অভাবে অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি ও দীর্ঘসূত্রতা বিদ্যমান; যার ফলে সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে। সার্বিকভাবে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে অংশগ্রহণমূলক ও সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ না থাকলে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

সুপারিশ

১. যেকোনো দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে রাসায়নিক বিপর্যয় রোধে জাতীয়ভাবে একটি রাসায়নিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং রাসায়নিক নিরাপত্তা বিষয়ে নির্দেশিকা তৈরি ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৩. এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীদের অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি সম্পর্কে বোঝাতে হবে এবং পুরানো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

৪. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সরাসরি তদারকির মাধ্যমে রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম সরকার নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে।

৫. ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ কারখানা চিহ্নিত করে সেগুলো বন্ধ করতে হবে, অথবা অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে স্বল্পমেয়াদি অবকাশ দিয়ে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানান্তরে রাজি না হলে এসব কারখানার সব ইউটিলিটি বন্ধ করতে হবে।

৬. তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্সের সুপারিশ বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার জন্য এবং আদালত অবমাননাকারী দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

৭. পুরানো ঢাকার অগ্নি-ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করতে হবে। ভবনগুলোতে নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি বহির্গমনব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। পর্যাপ্তসংখ্যক ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করতে হবে।

৮. রাসায়নিক গুদাম ও কারখানা প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক ও স্বচ্ছ করতে হবে।

৯. আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজউক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আইনে নিশ্চিত করতে হবে।

১০. পুরানো ঢাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি নিরসনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ইউনিট তৈরি করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২, ধারা ২(১১)(আ)। বিস্তারিত দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1103.html

২ মো. জহিরুল ইসলাম ও প্রফেসর ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসাইন, 'ফায়ার হ্যাজার্ড ইন ঢাকা সিটি : এন এক্সপ্লোরাটোরি স্টাডি অন মিটিগেশন মেজারস', *আইওএসআর জার্নাল অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, টোক্সিকোলজি অ্যান্ড* ফুড টেকনোলজি (আইওএসআর-জেইএসটিএফটি) ১২.৫ (২০১৮): ৪৬-৫৬; বিস্তারিত দেখুন : http://www.iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/Vol12-%20Issue%205/Version-1/G1205014656.pdf

৩ দেখুন *ঢাকা ট্রিবিউন*, ২৮ মার্চ ২০১৯।

৪ *প্রাগুক্ত*।

৫ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, *ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (১৯৯৫-২০১৫): স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান, ডিটেইলড প্ল্যান ফর ঢাকা সিটি, ডিএমডিপি প্রোজেক্ট, রাজউক*।

৬ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আদমশুমারি ২০১১,; বিস্তারিত দেখুন : http://203.112.218.65:8008/WebTest Application/userfiles/Image/PopCen2011/Com_Dhaka.pdf

৭ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ; অভীষ্ট ১১, লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫; বিস্তারিত দেখুন : http://www.plancomm.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/b0a75c6f_2cb4_41d7_ac89_75731c8860f6/2020-02-05-10-50-f876f9995e8b97a8d677d68a7af6d058.pdf

৮ ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮, ধারা ২(৬৩); পরিশিষ্ট-১ (বিধি ৫৯ (চ) দ্রষ্টব্য) ১২.০৩। বিস্তারিত দেখুন : http://rajuk.portal.gov.bd/sites/default/files/files/rajuk.portal.gov.bd/page/20b761b8_ab9c_4ec7_8692_0877fe834afd/DhakaImaratNirmanBidhimala-2008.pdf

৯ ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮, ধারা ২(৬৩); অগ্নি-প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩, ধারা ২(জ); এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, ২০০৬, অধ্যায় ২ (২.২)।

১০ দেখুন *ঢাকা ট্রিবিউন*, ২৮ এপ্রিল ২০১৯।

১১ দেখুন *দ্য ডেইলি স্টার*, ৭ জানুয়ারি ২০১৯।

[12] বিশ্বব্যাংক, *ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট*, ওয়াশিংটন ডিসি; বিস্তারিত দেখুন : http://documents1.worldbank.org/curated/en/945651468003307657/pdf/750620WP0P10210C00Dhaka0Development.pdf

[13] মো. মঞ্জুর আলম প্রামাণিক ও এম এ ইসলাম, 'প্রবলেম অব আরবান গভর্নেন্স অব ঢাকা সিটি উইথ ইন দ্য কনটেক্সট অব কো-অর্ডিনেশন অ্যামং ডিফারেন্ট এজেন্সিস', কনফারেন্স পেপার; বিস্তারিত দেখুন : https://www.researchgate.net/publication/317954243_Problems_of_Urban_Governance_of_Dhaka_City_within_the_context_of_co-ordination_among_different_agencies

করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ*

মো. জুলকারনাইন, মোরশেদা আক্তার, তাসলিমা আকতার ও মনজুর ই খোদা

গবেষণার প্রেক্ষাপট

করোনাভাইরাস রোগ বা কোভিড-১৯ একটি সংক্রামক রোগ, যা করোনাভাইরাসের নতুন একটা প্রজাতির মাধ্যমে মানুষকে আক্রান্ত করছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯-এ প্রথম বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাকে চীন সরকার উহান প্রদেশে অজানা কারণে নিউমোনিয়ার প্রাদুর্ভাবের তথ্য জানায়। ৭ জানুয়ারি ২০২০ চীন এই অজানা নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী হিসেবে একটি নতুন প্রজাতির করোনাভাইরাসকে চিহ্নিত করে। ৩০ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাস সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করে এবং ১১ মার্চ ২০২০ একে মহামারি বা অতিমারি (pandemic) হিসেবে ঘোষণা করে।[১] জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির করোনাভাইরাস রিসোর্স সেন্টারের তথ্যমতে, ১৪ জুন ২০২০ পর্যন্ত সারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশে মোট ৭৭ লাখ ৬৪ হাজার ৯৭৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং ৪ লাখ ২৯ হাজার ৬৬৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে।[২]

বাংলাদেশে ২১ জানুয়ারি থেকে করোনাভাইরাস আক্রান্তের নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়।[৩] ৮ মার্চ প্রথম তিনজন করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়[৪] এবং ১৮ মার্চ প্রথম একজন মৃত্যুবরণ করে।[৫] স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ১৪ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮৭ হাজার ৫২০ জন এবং ১ হাজার ১৭১ জন মৃত্যুবরণ করেছে।[৬] আক্রান্তের সংখ্যার হিসাবে ১৩ জুন পর্যন্ত সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ ১৮তম অবস্থানে রয়েছে এবং নতুন রোগী শনাক্ত হওয়ার সংখ্যার দিক থেকে ১১তম অবস্থানে রয়েছে।[৭] ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ার কারণে বাংলাদেশে এই রোগের ঝুঁকি আরও বেশি। বিশ্বব্যাংকের আশঙ্কা অনুযায়ী, করোনাভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫ কোটি মানুষ অতিদারিদ্র্যের কবলে পড়বে।[৮] এ ছাড়া এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আশঙ্কা করছে, করোনাভাইরাসের কারণে বাংলাদেশ জিডিপির প্রায় ১ দশমিক ১ শতাংশ হারাবে এবং প্রায় ১ কোটি লোক বেকার হবে।[৯] বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) মতে, করোনার প্রভাবে আয় কমে যাওয়ায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে এবং সার্বিকভাবে দারিদ্র্যের হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।[১০]

করোনাভাইরাস ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করলেও গণমাধ্যমে সরকারের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, দক্ষতা ও সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে ঘাটতি এবং অনিয়ম-

---

* ২০২০ সালের ১৫ জুন অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

দুর্নীতির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা এবং অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। ইতিপূর্বে টিআইবি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে। সরকারের গৃহীত কার্যক্রম অধিক কার্যকারিতার সঙ্গে বাস্তবায়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে এবং স্বাস্থ্য খাতে টিআইবির গবেষণাভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রমে প্রাধান্যের ধারাবাহিকতায় করোনাভাইরাসকে একটি জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় প্রাক-সংক্রমণ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে ও সংক্রমণকালে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।

এ গবেষণাটি মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর– গুণবাচক ও পরিমাণবাচক এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। নিঃসম্ভাবনা (Non-probability sampling) বা কনভেনিয়েন্স নমুনায়নের (Convenience) মাধ্যমে সারা দেশের সব বিভাগের মোট ৩৮টি জেলার ৪৭টি জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল (৯ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৩৩টি জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল ও ৫টি অন্যান্য হাসপাতাল) থেকে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য এবং ৪৩টি জেলা থেকে স্থানীয় নাগরিক (সাংবাদিক, শিক্ষক, পেশাজীবী) হতে ত্রাণ বিতরণের প্রত্যক্ষ তথ্য অনলাইন চেকলিস্টের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া টেলিফোনে মুখ্য তথ্যদাতার (চিকিৎসক ও সাংবাদিক) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন ও বিধি, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত তথ্য এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় পর্যায়ের বহুল প্রচারিত ছয়টি গণমাধ্যম (প্রিন্ট) থেকে নির্দিষ্ট ছকে ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলো দেশের সব ধরনের ভৌগোলিক ও অন্যান্য বৈচিত্র্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাই দৈবচয়নভিত্তিক না হলেও বর্তমান জরিপে প্রাপ্ত তথ্য সার্বিকভাবে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরে। এই গবেষণায় ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন ২০২০ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে মাঠপর্যায়ের জরিপের তথ্যগুলো ২০ মে পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় আওতা ও বিশ্লেষণকাঠামো

করোনাভাইরাস এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিচের সাতটি বিষয়ে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে–

১. করোনা প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন।
২. করোনাভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ (পরীক্ষাগার সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও পরীক্ষা কার্যক্রম)।
৩. করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসাব্যবস্থা (হাসপাতালের সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও সেবা)।
৪. সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (হাসপাতাল পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা)।
৫. কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধ (স্ক্রিনিং, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন)।
৬. করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি।
৭. ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি।

এই গবেষণায় করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব নির্দেশক হচ্ছে আইনের শাসন, দ্রুত সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহি, স্বচ্ছতা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার নানা ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান (মুজিববর্ষের নির্ধারিত অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস ও নববর্ষ উদযাপন) স্থগিত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় একাধিকবার দুর্নীতির ক্ষেত্রে ছাড় না দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় ১ লাখ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা ও স্বাস্থ্যবিমার উদ্যোগ গ্রহণ, অতিদরিদ্র ৫০ লাখ পরিবারের জন্য নগদ সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য।[১১] আগের চেয়ে ২ লাখ মেট্রিক টন বেশি পরিমাণ বোরো ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।[১২] চিকিৎসাব্যবস্থায় জনবলসংকট মোকাবিলায় চিকিৎসক, নার্স ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া করোনাসংকটকালে দ্রব্যমূল্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ছিল।

তবে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়, যা নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আইনের শাসনের ঘাটতি

করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দুটি আইন যথা 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২' ও 'সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮'- এর কোনোটিই যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং এর অধীনে থাকা দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী

আদেশাবলি-২০১৯ অনুসরণ না করার ফলে আইন অনুযায়ী বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ২৩ মার্চ কোভিড-১৯-কে সংক্রামক রোগ হিসেবে আইনে অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি হলেও[১৩] বিলম্বের কারণে আইন প্রয়োগ শুরু হওয়ার আগেই বাংলাদেশে কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংক্রামক রোগ আইন ২০১৮ অনুসারে সারা দেশকে 'সংক্রমিত এলাকা' বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ অনুসারে 'দুর্গত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা না করে 'ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে ঘোষণা করে[১৪], যা মাঠপর্যায়ে আইনের প্রয়োগ ও লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

দ্রুত সাড়াদানে বিলম্ব

সংক্রমণ বিস্তার রোধে বিদেশ থেকে আগমন নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি : করোনাভাইরাসকে অতিমারি হিসেবে ঘোষণা করার পরে বাংলাদেশে প্রায় দুই মাস পর সব দেশের ফ্লাইট বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশ প্রথম ১৫ মার্চ থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন দেশের ফ্লাইট বন্ধ করে[১৫] এবং পরে ২৮ মার্চ থেকে চীন ছাড়া সব আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণা করা হয়।[১৬] বিদেশ থেকে প্রবেশপথগুলো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার কারণে ২১ জানুয়ারি থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৬ লাখ ২৫ হাজার ৭৪৩ জন যাত্রীর আগমন ঘটে। বাংলাদেশে ২১ জানুয়ারি হতে বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আনা হলেও সব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরে হ্যান্ড হেল্ড স্ক্যানার দিয়ে যাত্রীদের স্ক্রিনিং করা হয়, যার মাধ্যমে শুধু শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা যায়।[১৭] ফলে করোনাভাইরাস আক্রান্তকে কার্যকরভাবে পৃথক করা সম্ভব হয়নি।

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কমিটি গঠনে বিলম্ব : ফেব্রুয়ারির শুরুতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সতর্ক করা হলেও বাংলাদেশ প্রায় দেড় মাস পর (১৬ মার্চ) 'কোভিড-১৯-এর জন্য জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনা' প্রণয়ন করে।[১৮] যার ফলে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া সংক্রমণ শুরু হওয়ার দেড় মাস পরে (১৮ এপ্রিল) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়।[১৯]

অভ্যন্তরীণ চলাচল ও জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা : সংক্রমণ বিস্তার রোধে ১৭ মার্চ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছুটি ঘোষণা[২০] এবং ২৬ মার্চ থেকে দেশব্যাপী ছুটি ঘোষণা করা হলেও এর সঙ্গে সঙ্গে গণপরিবহন বন্ধ না করার কারণে বিপুলসংখ্যক মানুষ ঢাকা ত্যাগ করে। এ ছাড়া বাংলাদেশে সব ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক গণজমায়েত নিষিদ্ধ করা হলেও খালেদা জিয়ার জামিন উপলক্ষে দলীয় নেতা-কর্মীদের জমায়েত এবং মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আতশবাজি পোড়ানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে। বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংকটকালেই নির্বাচন কমিশন একটি সিটি করপোরেশনসহ কয়েকটি সংসদীয় আসনের উপনির্বাচন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দায়িত্বহীন আচরণ করে।[২১] পরবর্তী সময়ে ব্যাপক সমালোচনার কারণে কয়েকটি নির্বাচন স্থগিত করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয়গুলোতে জমায়েত না করার নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিলম্ব (৬ এপ্রিল) লক্ষ করা যায়।[২২]

পরীক্ষাগার প্রস্তুতিতে বিলম্ব : করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সব সন্দেহভাজনের পরীক্ষার বিষয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গুরুত্ব প্রদান সত্ত্বেও ২৫ মার্চ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে মাত্র একটি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছিল।[২৩] এই সময়ে পরীক্ষার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও (এই সময়ে নির্ধারিত হটলাইনে প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষ পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করে) খুবই কমসংখ্যক পরীক্ষা করা হয় (৭৯৪টি)।[২৪] ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি পরীক্ষাগারের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকার বাইরে পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয় ২৫ মার্চের পর, তত দিনে সীমিত আকারে কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার শুরু হয়ে গেছে।[২৫]

সারণি ১ : সময় অনুসারে নমুনা পরীক্ষার চিত্র

সময়কাল	পরীক্ষাগারের সংখ্যা	দিনপ্রতি পরীক্ষা	দিনপ্রতি/ ল্যাবপ্রতি পরীক্ষা	কোভিডবিষয়ক ফোন কলের অনুপাতে পরীক্ষা
২৫ মার্চ পর্যন্ত	১	২৩	২৩	৬৩৯:১
২৫ মার্চ-১৫ এপ্রিল	১৭	১৭০	৩৮	১৪৩:১
১৫-৩০ এপ্রিল	৩০	৬৩৬	১১১	২৫:১
১-১৫ মে	৪১	১৩৮০	১৫৬	১৮:১
১৫-৩১ মে	৫২	২৫৩৪	১৭৯	২২:১
১-১৩ জুন	৬০	১৩৪৯১	২৪১	১৩:১

চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতিতে বিলম্ব : করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সব ধরনের প্রস্তুতির দাবি করা হলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর প্রায় ৪৪ শতাংশ সংক্রমণের তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে।

চিত্র ১ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালসমূহের প্রস্তুতি শুরুর সময় (%)

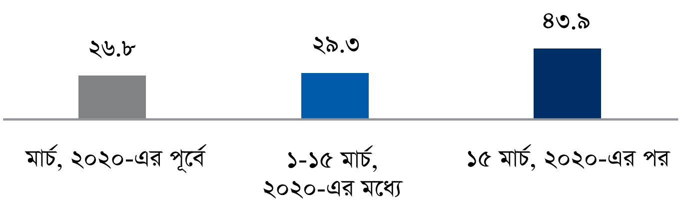

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাস মোকাবিলায় জাতীয় পর্যায়ের সক্ষমতা পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বললেও ২১ শতাংশ হাসপাতালের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ঘাটতি বা চাহিদা যাচাই করা হয়নি। স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ

করা গেছে– মাত্র ২২ শতাংশ হাসপাতালে সব স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিবিজিএনএস ও এসএনএসআর নামক নার্সদের দুটি সংগঠনের একটি জরিপ অনুসারে, দেশের ৮৬ শতাংশ নার্সেরই সংক্রমণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণবিষয়ক (আইপিসি) প্রশিক্ষণ নেই।[২৬]

চিত্র ২ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোয় স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ (%)

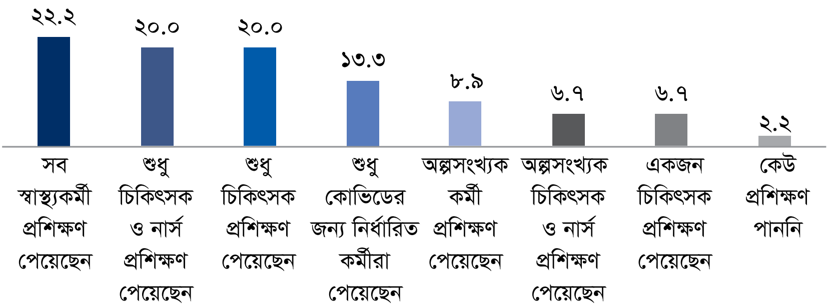

করোনাসংকট মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনার সীমাবদ্ধতা : করোনাসংকট মোকাবিলায় সরকার দ্রুততার সঙ্গে ১৯টি প্যাকেজে মোট ১ লাখ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা (জিডিপির ৩ দশমিক ৩ শতাংশ) করলেও এ ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এসব প্রণোদনা মূলত ব্যবসায়ীবান্ধব, যেখানে সুদ কমিয়ে ঋণসহায়তা বাড়িয়ে মুদ্রা সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সব শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে এই সহায়তা পৌঁছানোর নিশ্চয়তা নেই। এ ছাড়া এসব প্রণোদনায় চাহিদার সংকোচন উত্তরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেই। মৌলিক চাহিদা পূরণে ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে অর্থ সঞ্চালন বা পর্যাপ্ত নগদ সহায়তার অনুপস্থিতি রয়েছে। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মহীন পাঁচ কোটি দিনমজুর ও শ্রমিক, অস্থায়ী কর্মীর জন্য এবং খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। মাত্র ১০ শতাংশ বোরো ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়েছে। কৃষি প্রণোদনার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষিদের জন্য প্রণোদনার সুযোগ নেই এবং কৃষিঋণ মওকুফের ঘোষণা দেওয়া না হলেও কৃষিপণ্যের বিপণনব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের জন্য অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ঋণখেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়েছে।

ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির প্রস্তুতিতে ঘাটতি : গবেষণাভুক্ত ৪৩টি জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, ২০ শতাংশ জেলায় ত্রাণ বিতরণের জন্য কোনো পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়া হয়নি এবং ৭৮ শতাংশ জেলার ক্ষেত্রে উপকারভোগীর তালিকা হালনাগাদ করা হয়নি। এ ছাড়া অধিকাংশ জেলায় (৮২ শতাংশ) চাহিদার অনুপাতে অর্ধেক বা তারও কম পরিমাণে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে এবং বিতরণকৃত ত্রাণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ জেলায় (৯০ শতাংশ) চাহিদার অনুপাতে অর্ধেক বা তারও কমসংখ্যক উপযুক্ত মানুষ ত্রাণ পেয়েছে।

সক্ষমতা ও কার্যকারিতার ঘাটতি

অকার্যকর কমিটি : করোনা মোকাবিলায় দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে নয় ধরনের কমিটি গঠন করা হলেও এসব কমিটির কার্যকারিতায় ঘাটতি লক্ষ করা যায়। জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠক ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হলেও[২৭] সেই মিটিংয়ে শুধু ডেঙ্গুবিষয়ক আলোচনা করে শেষ করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই কমিটির কোনো বৈঠকের তথ্য পাওয়া যায়নি। এই কমিটির সভাপতিসহ অন্যান্য সদস্যের অনেক সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবগত না থাকার বিষয়টি লক্ষ করা গেছে (পোশাক কারখানা খোলা ও বন্ধ, ঢাকায় প্রবেশ ইত্যাদি)। এ ছাড়া জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কমিটিগুলোর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয়। জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির সভা নিয়মিত হলেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (শপিং মল বা পোশাক কারখানা খোলা, লকডাউন প্রত্যাহার করা) কমিটির পরামর্শ উপেক্ষিত থাকা এবং অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাদের ওপর নির্ভরতা লক্ষ করা গেছে।

পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি : বাংলাদেশে করোনা আক্রান্তের পরীক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ হলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে কম পরীক্ষা হচ্ছে (শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ)। সব সময় বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থাকে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হলেও পরীক্ষার হারের দিক থেকে সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৯তম।[২৮] ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও সক্ষমতার ঘাটতির কারণে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি।

সারণি ২ : দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর পরীক্ষার হার

দেশ	জনসংখ্যার অনুপাতে পরীক্ষার হার (%)
মালদ্বীপ	৫.৩৬
ভুটান	২.৬৬
নেপাল	১.০১
শ্রীলঙ্কা	০.৩৮
ভারত	০.৩৯
পাকিস্তান	০.৩৭
বাংলাদেশ	০.২৯
আফগানিস্তান	০.১৪
আরব আমিরাত	২৬.৫৭
ডেনমার্ক	১৩.৩৩
স্পেন	৯.৫৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭.১৯

জাতীয় কলসেন্টার ও আইইডিসিআরের নির্ধারতি হটলাইনে ১৪ জুন পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ ফোন কল এলেও সেই তুলনায় পরীক্ষার সংখ্যা খুবই কম (প্রায় পাঁচ লাখ)। বাংলাদেশে পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশই ঢাকাকেন্দ্রিক (৬০টি পরীক্ষাগারের মধ্যে ২৭টি ঢাকা শহরের মধ্যে)। সিলেট ও রংপুর বিভাগে দুটি করে এবং বরিশাল বিভাগে একটি পরীক্ষাগার দিয়ে করোনা আক্রান্তের পরীক্ষা করা হচ্ছে। বর্তমানে মাত্র ২১টি জেলায় পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে মাত্র ৪১ দশমিক ৩ শতাংশ হাসপাতাল নিজ জেলা থেকেই পরীক্ষা করাতে পারে, বাকি ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ হাসপাতালে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার জন্য বিভাগীয় শহরে বা ঢাকায় পাঠাতে হয়।

চিত্র ৩ : জেলা পর্যায়ে চাহিদার তুলনায় সন্দেহভাজন রোগীর পরীক্ষার হার (%)

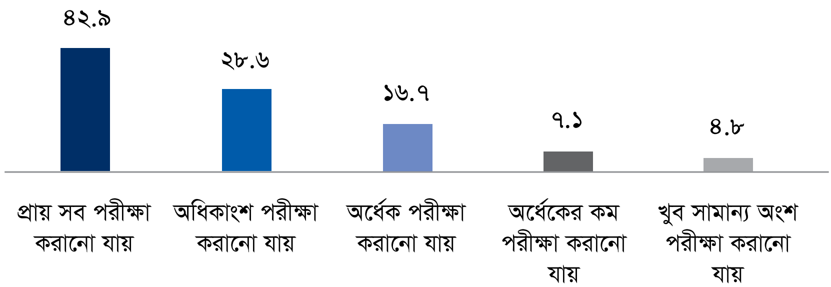

টেকনোলজিস্ট সংকট, মেশিন নষ্ট থাকা, জনবল ও মেশিন সংক্রমিত হওয়া এবং সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে মেশিনের সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে নমুনা পরীক্ষা করছে এমন ১৩টি হাসপাতাল ছাড়া ঢাকা ও ঢাকার বাইরে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ৬০টি পরীক্ষাগারে প্রায় ৮৫টির মতো পিসিআর মেশিন দিয়ে প্রায় ২৪ হাজার নমুনা পরীক্ষার সক্ষমতা থাকলেও সর্বশেষ ১৪ দিনে গড়ে ১৩ দশমিক ৬ হাজার নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ১৫ মে থেকে প্রতিদিন গড়ে চার থেকে পাঁচটি পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না। ২৫ মে সর্বোচ্চ ১১টি এবং ১৫ ও ২৯ মে আটটি করে পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হয়নি। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি)– এর করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরীক্ষার জন্য আটটি পিসিআর মেশিন এবং নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী থাকায় অনুমোদন পাওয়ার তারিখ থেকে (৩০ মার্চ, ২০২০) ৩১ মে পর্যন্ত তারা প্রতিদিন ৭০০টি[২৯] করে দুই মাসে ৪২ হাজার নমুনা পরীক্ষা করতে সক্ষম হলেও তাদের দিয়ে মাত্র ১৫ হাজার ৬৭৮টি পরীক্ষা করানো হয়।

আদালতে একটি মামলা চলমান থাকায় দীর্ঘ ১১ বছর ধরে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।[৩০] ফলে জনবলসংকটের কারণে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষায় সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে নমুনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ভুল প্রতিবেদন আসছে। এসব ঘাটতির কারণে পরীক্ষাগারগুলোতে সংগৃহীত নমুনা জমা হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন নমুনা সংগ্রহ করতে বিলম্ব হচ্ছে। করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ ও প্রতিবেদন দিতে কখনো কখনো ৮ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত বিলম্ব হচ্ছে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি পরীক্ষা করানোর ক্ষেত্রে যোগাযোগ করতে না পারা, নমুনা সংগ্রহ না করা, নমুনা দিতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা, দীর্ঘ লাইন, রাস্তায় সারারাত অপেক্ষা, একাধিকবার কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হওয়া, গাদাগাদি করে বসিয়ে রাখা ইত্যাদি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এসব সমস্যার কারণে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫৭ শতাংশ হাসপাতাল প্রয়োজনের চেয়ে অর্ধেক সংখ্যক পরীক্ষা করাতে বাধ্য হচ্ছে।

চিকিৎসাব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি : বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের দাবি করলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর ৭৪ দশমিক ৫ শতাংশেই দক্ষ জনবলের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (৫১ দশমিক ১ শতাংশ), প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (৫৯ দশমিক ৬ শতাংশ), নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী (৫১ দশমিক ১ শতাংশ) ইত্যাদি বিষয়ে সক্ষমতার ব্যাপক ঘাটতি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক হাসপাতালে লক্ষ করা যায়, যা করোনা আক্রান্তের চিকিৎসাসহ অন্যান্য সাধারণ সেবা কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারি হাসপাতালগুলোর শয্যাসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশে ৩ হাজার ৫০০ আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর থাকার কথা থাকলেও ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে সরকারি হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ ছিল মাত্র ৪৩২টি; ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের ৪৭টি জেলায় কোনো আইসিইউ সুবিধা ছিল না। করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য ২৫ মার্চ পর্যন্ত সারা দেশে মোট আইসিইউ ছিল মাত্র ২৯টি, ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ছিল মাত্র ১৪২টি এবং ১ জুন পর্যন্ত ছিল মাত্র ৩৯৯টি।[৩১]

চিত্র ৪ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোয় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানের (%)

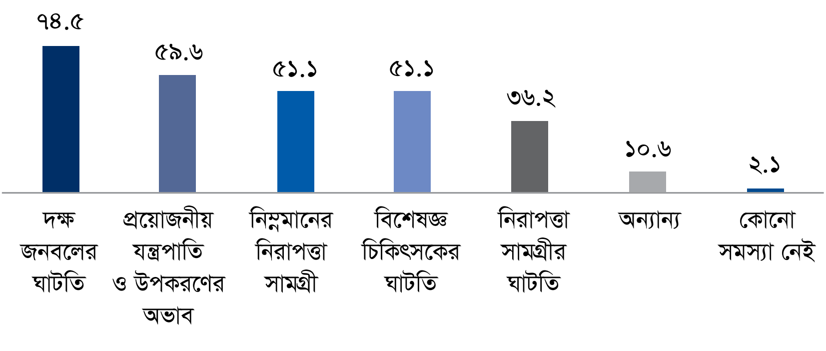

২৬ মার্চ পর্যন্ত শুধু রাজধানীর নির্ধারিত ৫টি হাসপাতালে ২৯টি ভেন্টিলেটর ছিল[৩২], যদিও সরকারের দাবি অনুযায়ী এর সংখ্যা ৫০০টি।[৩৩] বর্তমানে সারা দেশে মোট ভেন্টিলেটরের সংখ্যা ১ হাজার ২৬৭টি। এর মধ্যে মাত্র ১৯০টি করোনার চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে ঢাকায় ৭৯টি এবং অন্যান্য জেলা শহরে ১১১টি।[৩৪] ইমপেরিয়াল কলেজ লন্ডনের একটি গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে, ৩০ জুনের মধ্যে উচ্চচাপযুক্ত অক্সিজেনসমৃদ্ধ শয্যার প্রয়োজন হবে প্রায় ২০ হাজার এবং ভেন্টিলেটরসহ আইসিইউ শয্যার প্রয়োজন হবে ৫ হাজার ২৫৪টি। ভেন্টিলেশন সাপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল অক্সিজেনব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি হলেও বাংলাদেশে মাত্র ২১টি হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।[৩৫] কোভিড নির্ধারিত হাসপাতালগুলোয় ভেন্টিলেটর মেশিন, পেশেন্ট মনিটর, পালস অক্সিমিটার, এবিজি মেশিন উইথ গ্লুকোজ অ্যান্ড ল্যাকটেট, ডিফেব্রিলেটর, ইসিজি মেশিন, পোর্টেবল ভেন্টিলেটর, এসি, ডিহিউমিডিফায়ার, অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিতে অক্সিজেন সিলিন্ডার ইত্যাদির ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।

চিত্র ৫: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালোর স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা সামগ্রী প্রাপ্তি (%)

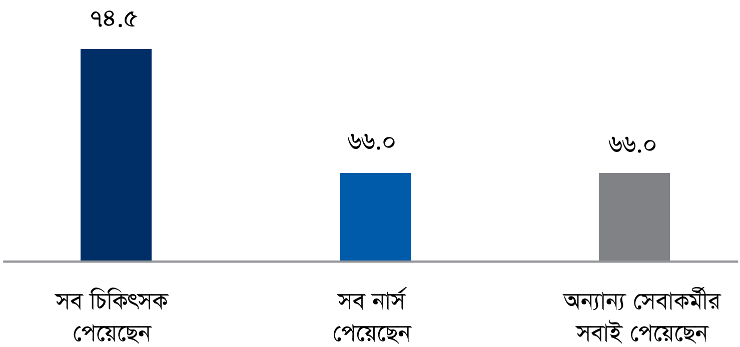

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর ৫৩ শতাংশে করোনার প্রভাবে সাধারণ চিকিৎসাসেবায় ব্যাঘাত ঘটছে, যার মধ্যে ৭১ শতাংশ হাসপাতাল জানিয়েছে, নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের কারণে অনেক স্বাস্থ্যকর্মী সেবা দেওয়া থেকে বিরত থাকছেন বা আক্রান্ত হচ্ছেন। ফলে তাদের এই সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। করোনা আক্রান্তের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালের চিকিৎসায় প্রস্তুতি ও সক্ষমতার ঘাটতির কারণে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসাসহ সাধারণ চিকিৎসাসেবায় নানা ধরনের অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে জনগণের চিকিৎসাসেবা গ্রহণে নানা ধরনের দুর্ভোগ লক্ষ করা গেছে।

সংক্রমণ প্রতিরোধব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি: ১১ জুন ২০২০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএসডি) সারা দেশে প্রায় ২৩ লাখ সুরক্ষাসামগ্রী (পিপিই) বিতরণ করেছে বলে দাবি করেছে।[৩৬] এই দাবি অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীর (প্রায় ৭৫ হাজার)[৩৭] কমপক্ষে ৩০ সেট সুরক্ষাসামগ্রী পাওয়ার কথা

থাকলেও অনেক স্বাস্থ্যকর্মী এখনো একটিও পাননি বলে হাসপাতাল থেকে তথ্য পাওয়া গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর প্রায় ২৫ শতাংশের সব চিকিৎসক এবং ৩৪ শতাংশের সব নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী পিপিই পাননি বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়া অধিকাংশ হাসপাতালের (৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ) স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত মান অনুযায়ী সুরক্ষাসামগ্রী সরবরাহ না করার অভিযোগও এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পিপিই সরবরাহ না করে পৃথকভাবে গাউন, গগলস, সার্জিক্যাল মাস্ক, গ্লাভস, শু-কাভার, হেড কাভার, ফেস শিল্ড সরবরাহ করা হয়। মানসম্মত ও প্রয়োজনীয় সুরক্ষাসামগ্রীর ঘাটতির কারণে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১৪ জুন পর্যন্ত ৩৮ জন চিকিৎসক ও সাতজন নার্স মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ১ হাজার ১৯০ জন চিকিৎসক ও ১ হাজার ১০২ জন নার্স করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।[৩৮]

এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) তাদের একটি গবেষণায় দেখায় যে, করোনাসংকটকালের প্রথম এক মাসে ১৪ হাজার ৫০০ টন সংক্রামক প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে শুধু হাসপাতালগুলো থেকে উৎপন্ন হয় ২৫০ টন।[৩৯] বর্তমানে বাংলাদেশে মাত্র চারটি বিভাগীয় শহরে সীমিত আকারে মেডিকেল বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা থাকায় এই বিপুল পরিমাণে বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে ফেলা হচ্ছে এবং এর একটি অংশ একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী পুনরায় ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে ফেলা হচ্ছে। এ ছাড়া পিপিইর ব্যবহার, ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত ও বিনষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে।

চিত্র ৬ : হাসপাতালে করোনাভাইরাস সম্পর্কিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (%)

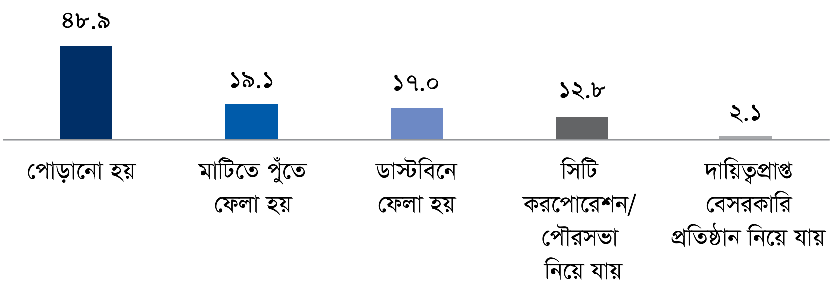

কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধে সক্ষমতার ঘাটতি : বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের স্ক্রিনিং করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রবেশপথে ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থল, সমুদ্র ও বিমানবন্দরে সাতটি থার্মাল আর্চওয়ে স্ক্যানারের মধ্যে মাত্র একটি সচল ছিল। চীনের উহানফেরত ৩১২ জন বাংলাদেশিকে আশকোনা হজক্যাম্পে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। পরবর্তীকালে ইতালিফেরত ১৬৪ জনকে হজক্যাম্পে রাখার সিদ্ধান্ত হলেও বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারণে তাদের

পরদিন নিজ দায়িত্বে হোম কোয়ারেন্টাইনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের পরিবর্তে বিদেশফেরত অধিকাংশ প্রবাসীকে নিজ দায়িত্বে হোম কোয়ারেন্টাইনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত বিদেশফেরত যাত্রীদের মাত্র ৮ শতাংশ হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন।[৪০] সচেতনতার ঘাটতি, প্রশাসনের সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হোম কোয়ারেন্টাইন কার্যকর হয়নি।

সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা : সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতার ঘাটতি, কঠোর আইন প্রয়োগের ঘাটতি এবং সরকারের পক্ষ থেকে ভুল ও বিভ্রান্তিকর বার্তা প্রদানের ফলে সামাজিক দূরত্ব বা লকডাউন ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। একদিকে আইসোলেশন মানতে বলা হয়েছে আবার অন্যদিকে গণপরিবহন, কলকারখানা, শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে। গণপরিবহন বন্ধ না করে ছুটি ঘোষণার ফলে প্রায় ১ কোটির বেশি মানুষ ঢাকা ছেড়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছুটি ঘোষণার পর পোশাকশ্রমিকদের ঢাকা ছেড়ে গ্রামে যাওয়া, কারখানা খুলে তাদের ঢাকায় ফেরানো, আবার বন্ধ ঘোষণা এবং তাদের ফেরত পাঠানো হয়। ২৬ এপ্রিল পুনরায় পোশাক কারখানা ও উপাসনালয়, ১০ মে থেকে দোকানপাট, শপিং মল সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়া, ঈদের আগে ব্যক্তিগত পরিবহনে আন্তজেলা চলাচল উন্মুক্ত করার মাধ্যমে সার্বিকভাবে লকডাউন পরিস্থিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে। ত্রাণ বিতরণে বেশির ভাগ জেলায় (৯৮ শতাংশ) সামাজিক দূরত্ব মানা হয়নি।

অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের ঘাটতি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' গঠিত হওয়ার বিধান[৪১] থাকলেও তা আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে এককভাবে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। করোনাভাইরাস মোকাবিলার অন্যতম বিষয় হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা। অথচ এ ক্ষেত্রে শীর্ষ নীতিনির্ধারণী জায়গায় কোনো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ নেই। এ ছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক করোনাকালে বিভিন্ন বিষয়ে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করে তা প্রত্যাহার, করোনাসংক্রান্ত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দুই ধরনের তথ্য প্রদান, বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা চিকিৎসা প্রদান বিষয়ে বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে। যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে করোনা হাসপাতাল তৈরির বিষয়ে চারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন এবং সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালেও করোনা চিকিৎসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে তা পরিবর্তন করা হয়।

আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা : করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, যোগাযোগ, বাণিজ্য, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রত্যাশিত হলেও তাদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যোগাযোগব্যবস্থা চালু রেখেই ছুটি ঘোষণার ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষের ঢাকাত্যাগ, জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যানের (স্বাস্থ্যমন্ত্রী)

অগোচরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সারা দেশে কার্যত লকডাউনের মাঝে পোশাকশ্রমিকদের ঢাকায় ফেরা, পোশাক কারখানা খোলা রাখা, মসজিদে জামাতে নামাজ বন্ধ, ঈদের সময় রাস্তা খুলে দেওয়া বা বন্ধ রাখা ইত্যাদি ঘটনা আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতার বিষয়টি উন্মোচন করে, যা করোনা সংক্রমণের বিস্তারে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। এ ছাড়া করোনা প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় কমিটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যেমন প্রথমে পুলিশের মহাপরিদর্শককে (আইজিপি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পরবর্তীকালে সমালোচনার কারণে কমিটি সংশোধন করে আইজিপিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বেসরকারি পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করায় ব্যর্থতা : টিআইবির সর্বশেষ খানা জরিপে দেখা যায়, বাংলদেশে ৭৭ দশমিক ৩ শতাংশ পরিবার বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ করে।[৪২] বাংলাদেশে ৬৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও প্রায় পাঁচ হাজার বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক থাকলেও[৪৩] করোনাভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসায় তাদের ভূমিকা কী হবে বা তারা কীভাবে চিকিৎসাসেবা প্রদান করবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন ও সমন্বয় করা হয়নি বা কোনো ধরনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন করোনা চিকিৎসায় তাদের প্রস্তুতির দাবি করলেও এই বিপর্যয়ের সময়ে অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তারা অন্যান্য চিকিৎসাসেবাও বন্ধ করে দিয়েছে, যা বিপুলসংখ্যক মানুষের দুর্ভোগ ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সব বেসরকারি হাসপাতালকে একাধিকবার করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশ দিলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ তদারকির ঘাটতি ছিল। করোনাভাইরাস মোকাবিলার সব কার্যক্রম সরকারের একক নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলেও (বসুন্ধরার হাসপাতাল স্থাপন, রেমডিসিভির ব্যবহারের অনুমোদন) কোনো কোনো ক্ষেত্রে (গণস্বাস্থ্যের টেস্ট কিট অনুমোদন) বিলম্বিত সিদ্ধান্ত প্রদানের কারণে এবং সরকারের যথাযথ সহায়তার অভাবে বা বিরোধিতার কারণে বেসরকারি পর্যায়ের বেশ কিছু স্বপ্রণোদিত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়ের ঘাটতি : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬০ শতাংশ এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণের কারণে অনেক ক্ষেত্রে ত্রাণ পাওয়ার প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তিরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

স্বচ্ছতার ঘাটতি

তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপ : নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার ও সরকারের গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতে গণমাধ্যমের অবাধ ও মুক্ত ভূমিকা পালনে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতে তথ্য গোপন ও তথ্য প্রচারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে বরং স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় আরও বেশি অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা অতীব জরুরি। কিন্তু দেশে করোনার প্রকোপ শুরুর পর থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সব চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া

জনসমক্ষে, সংবাদপত্রে বা অন্য কোনো গণমাধ্যমে কোনো বিবৃতি বা মতামত প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, যা সেবা কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যের প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব : দেশের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ বিতরণে চুরি ও আত্মসাতের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে গণমাধ্যমকর্মীদের বাধা, হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে। কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮- এর আওতায় মোট ৬৭টি মামলা হয় এবং এই সময়কালে ৩৭ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করোনাভাইরাস সম্পর্কিত গুজব ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে কার্টুনিস্ট, সাংবাদিকসহ ৭৯টি ঘটনায় মোট ৮৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রচারণা বা গুজব মনিটরিং করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের ৩০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের জন্য নজরদারি সেল গঠন করা হয়। পরে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হলেও নজরদারি অব্যাহত রয়েছে বলে জানা যায়।[৪৪]

করোনাভাইরাস-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি : করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এমন অনেকেই সরকারি হিসাবের বাইরে থেকে যাচ্ছে। করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষা না হলে বা হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা মৃত ব্যক্তিদের তথ্য কর্তৃপক্ষকে না জানালে তা সরকারি হিসাবে যোগ হচ্ছে না। এ ছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন কবরস্থানে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তিদের সৎকারের সংখ্যার মধ্যে অমিল রয়েছে। ফলে করোনাভাইরাসে মৃতের সরকারি হিসাব নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম-দুর্নীতি : করোনা আক্রান্তের চিকিৎসাব্যবস্থায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অনিয়ম-দুর্নীতি লক্ষ করা গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলো থেকে নিম্নমানের সুরক্ষাসামগ্রী সরবরাহের বিষয়ে (৫৯ শতাংশ হাসপাতাল) সবচেয়ে বেশি অভিযোগ উঠে এসেছে।

চিকিৎসায় অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার অভিযোগ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২৩ শতাংশ হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া যায়। যার মধ্যে করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা না পাওয়া, স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগীদের কাছে না গিয়ে ইন্টারকমে ফোন করে খোঁজখবর নেওয়া, দরজার বাইরে খাবারের প্যাকেট রেখে যাওয়া, রোগীর কক্ষ পরিষ্কার না করা, যথাসময়ে অক্সিজেন সরবরাহ না করা, রোগীর অ্যাটেনডেন্টদের দিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ বহন করানো, হাসপাতালে ভর্তি রোগী মারা গেলে নমুনা পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা, নারী ও পুরষদের একই আইসোলেশন কক্ষে রাখা এবং রোগী মারা গেলেও মৃতদেহ দীর্ঘ সময় না সরানো ইত্যাদি অবহেলা ও অব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৭ : গবেষণা অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালে কোভিড সেবা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি (%)

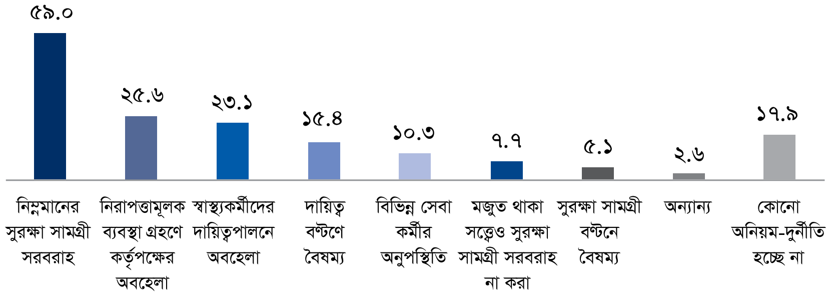

পরীক্ষাগারে দুর্নীতি : সরকারের কাছ থেকে বাণিজ্যিকভাবে পরীক্ষার অনুমোদন পাওয়া অধিকাংশ বেসরকারি পরীক্ষাগার করোনা পরীক্ষায় সরকার-নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত ১ হাজার থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রয়োজনের চেয়ে পরীক্ষাগারের সংখ্যা কম থাকায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষার বিষয়টিকে পুঁজি করে বিভিন্ন পরীক্ষাগারের সামনে থাকা দালাল সিরিয়াল বিক্রি করছে। এ ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিরা ১ হাজার থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকায় এই সিরিয়াল কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে 'করোনাভাইরাস আক্রান্ত নয়' এমন সার্টিফিকেট বিক্রি করা হচ্ছে।

চিকিৎসাসামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি : করোনার কারণে সৃষ্ট দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে ৫ থেকে ১০ গুণ বাড়তি মূল্যে মানহীন সুরক্ষাসামগ্রী ক্রয় করে একটি চক্র লাভবান হচ্ছে এবং এসব মানহীন সামগ্রী হাসপাতালে সরবরাহ করে স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। একটি সিন্ডিকেট বিভিন্ন ফার্মের নামে সব ধরনের ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায় এবং এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একাংশের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে এন-৯৫ মাস্ক লেখা মোড়কে সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্ক সরবরাহ এর একটি উদাহরণ।

চলমান করোনা পরিস্থিতিতে পিপিই, মাস্কসহ বিভিন্ন সামগ্রী একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে। এই ক্রয়-প্রক্রিয়া নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও কেন্দ্রীয় ঔষধ প্রশাসনের দু-একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়া অন্যরা কিছুই জানতেন না। এতে করে কোন সামগ্রীর মূল্য কত তা জানা যায়নি। বেশির ভাগ সামগ্রী মৌখিক আদেশে সরবরাহ করা হয়েছে। আবার লিখিতভাবে যেসব কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোরও মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। বর্তমানে তীব্র সংকট মোকাবিলায় বিশ্বব্যাংকের অর্থে ভেন্টিলেটর আমদানির পরিকল্পনা নেওয়া হলেও ক্রয়-প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির অভিযোগে করোনাকালের ১২ সপ্তাহেও ক্রয়াদেশ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া 'করোনাভাইরাস মোকাবিলায় জরুরি সহায়তা' শীর্ষক প্রকল্পে অস্বাভাবিক ক্রয়মূল্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান বাজারমূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বাড়িয়ে প্রতিটি সামগ্রীর মূল্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

সারণি ৩ : 'করোনাভাইরাস মোকাবিলায় জরুরি সহায়তা' প্রকল্পে দুর্নীতি

সরঞ্জাম	প্রস্তাবিত ক্রয়মূল্য (টাকা)	বর্তমান বাজারমূল্য (টাকা)
সেফটি গগলস (১ লাখ)	৫০০০	৫০০ - ১০০০
পিপিই (১ লাখ ৭ হাজার ৬০০)	৪৭০০	১০০০ - ২০০০
বুট শু (৭৬ হাজার ৬০০ জোড়া)	১৫০০	৩০০ - ৫০০
কম্পিউটার সফটওয়্যার (৫টি)	৫৫ কোটি	স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সফটওয়্যারের দাম গড়ে ৩৩ হাজার মার্কিন ডলার (প্রায় ২৮ লাখ টাকা)
ওয়েবসাইট উন্নয়ন (৪টি)	১০.৫ কোটি	ওয়েবসাইট প্রতি ১ থেকে ২ লাখ টাকা
অডিও-ভিডিও ক্লিপ (৩০টি)	১১.৫ কোটি	বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত বিভিন্ন অডিও-ভিডিও ক্লিপ (১ থেকে ২ মিনিট) তৈরির গড় খরচ প্রায় ৫ লাখ টাকা

একটি হাসপাতালে ব্যবহৃত পিসিআর মেশিন থাকা সত্ত্বেও নতুন পিসিআর মেশিন ক্রয়ের চাহিদা প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া স্বাস্থ্য খাত দুর্নীতিগ্রস্ত থাকার কারণে অনেক অবকাঠামো ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়নি। একটি মেডিকেল কলেজে ক্রয়সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা চলমান থাকায় পাঁচ বছর অব্যবহৃত অবস্থায় ১৬টি ভেন্টিলেটর পড়ে ছিল। পরে ১০টি সচল করা হয়। পরীক্ষাগারের সম্প্রসারণ করতে সরকারিভাবে ৩১টি আরটি পিসিআর মেশিন ক্রয় করা হয়। করোনাসংকটকালে বিশ্বব্যাপী চাহিদার কারণে সরবরাহকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ২০০৯ সালের পুরোনো মডেলের পিসিআর মেশিন সরবরাহ করে। মেশিনের ত্রুটির কারণে কয়েকটি হাসপাতাল এই মেশিন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কয়েকটি পরীক্ষাগারে বারবার পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার এটা একটি কারণ।

স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপত্তাসামগ্রী বণ্টনে অনিয়ম : গবেষণায় জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলো থেকে নিরাপত্তাসামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে কিছু অনিয়মের চিত্র উঠে আসে। অনেক প্রতিষ্ঠানে মজুত থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তাসামগ্রী বণ্টন করা হয়নি (৭ দশমিক ৭ শতাংশ) এবং নিরাপত্তাসামগ্রী বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য (৫ দশমিক ১ শতাংশ), অর্থাৎ পছন্দের সহকর্মীদের মধ্যে বা শুধু কর্মকর্তা পর্যায়ে সুরক্ষাসামগ্রী বণ্টনের বিষয়টি উঠে এসেছে।

ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতি : গবেষণা এলাকার শতকরা ৮২ ভাগ এলাকায় সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে এবং প্রায় ৪২ ভাগ এলাকার ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণে কোনো তালিকা অনুসরণ না করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া গবেষণা অন্তর্ভুক্ত এলাকার শতভাগ ক্ষেত্রেই অতিদরিদ্রদের

নগদ সহায়তা (২ হাজার ৫০০ টাকা) প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে। নগদ সহায়তার তালিকায় বিত্তশালী ও জনপ্রতিনিধিদের সচ্ছল আত্মীয়স্বজনের নাম থাকা এবং একই মোবাইল নম্বর ২০০ জন উপকারভোগীর নামের বিপরীতে ব্যবহৃত হওয়ার অভিযোগ উঠে এসেছে। প্রায় সব গবেষণা এলাকার ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণে সামাজিক দূরত্ব না মানার অভিযোগ রয়েছে।

সারণি ৪ : সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে সমস্যার ধরন

সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে সমস্যার ধরন	এলাকা (%)
রাজনৈতিক বিবেচনায় তালিকাভুক্তি	৮১ দশমিক ৪
জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকা	৬৭ দশমিক ৪
স্থানীয় অধিবাসী না হওয়ায় তালিকাভুক্ত না করা	৪৮ দশমিক ৮
চাঁদা দিতে রাজি না হওয়া	৭ দশমিক ৯
স্বজনপ্রীতি, নিজ থেকে যোগাযোগ না করলে নাম না ওঠানো	২৩ দশমিক ৩
কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে না	২ দশমিক ৩

১০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ত্রাণ বিতরণে ২১৮টি দুর্নীতির ঘটনায় মোট ৪ লাখ ৫৯ হাজার ৮৭০ কেজি ত্রাণের চাল উদ্ধার করা হয়েছে। এসব দুর্নীতির ঘটনায় ৮৯ জন জনপ্রতিনিধিকে (ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, জেলা পরিষদ সদস্য, পৌর কাউন্সিলর ইত্যাদি) সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। গবেষণাভুক্ত এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এসব দুর্নীতির ক্ষেত্রে মাত্র ৪ শতাংশ এলাকায় জড়িত সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জবাবদিহির ঘাটতি

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতা, কিছু কার্যক্রম সম্প্রসারণ না করে দুর্নীতির উদ্দেশ্যে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং এই দুর্যোগকালে অনিয়ম-দুর্নীতি করলেও দায়ী ব্যক্তিদের যথাযথ জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যথাযথভাবে আন্তজেলা চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতা, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রারম্ভিক পর্যায়ে পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ না করা, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় বেসরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ না করা, এন-৯৫ মাস্ক ক্রয়ে দুর্নীতি, নিম্নমানের পিসিআর মেশিন ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে দায়ী ও জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনা, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ-সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি। উপরন্তু সরবরাহকৃত মাস্ক ও সুরক্ষা পোশাকের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার কারণে বিভিন্ন

জায়গায় চারজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা (বদলি, কারণ দর্শানো নোটিশ, ওএসডি) গ্রহণ করা হয়েছে। জবাবদিহি নিশ্চিতে সীমিত আকারে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই লোকদেখানো (যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করে দ্রুততার সঙ্গে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালের ছয়জন চিকিৎসককে সাময়িক বরখাস্ত করা,) এবং এসব ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া করোনাভাইরাস সম্পর্কিত সরকারি প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করা ও দুর্নীতিগ্রস্তের বদলে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীকে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসার প্রবণতা প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে উৎসাহ প্রদান করেছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পনাহীনতা, সুশাসনের ঘাটতি ও অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের কারণে স্বাস্থ্য খাতের দুর্বল সক্ষমতা করোনার সংকট উন্মোচিত হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি প্রকটভাবে লক্ষ করা গেছে। চীনে করোনার প্রাদুর্ভাবের পর তিন মাস সময় হাতে পেয়েও করোনাভাইরাস মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ না করায় এবং সুশাসনের ঘাটতির কারণে দেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। একদিকে প্রস্তুতিহীনতা, সমন্বয়হীনতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে করোনাভাইরাস আক্রান্তের অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা; অন্যদিকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষাগারের সম্প্রসারণ না করে বিপুলসংখ্যক মানুষকে পরীক্ষার আওতার বাইরে রাখা এবং কঠোরভাবে চলাচল নিয়ন্ত্রণ না করার কারণে সংক্রমণ সারা দেশে বিস্তার লাভ করেছে। লকডাউনসহ সব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে আমলানির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে।

স্বাস্থ্য খাতের ক্রয়ে দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণের জন্য করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ব্যাপক সামাজিক সম্পৃক্ততা বা অংশগ্রহণের অভাব, মাঠপর্যায়ে করোনা সম্পর্কিত তথ্য প্রচারণায় ঘাটতির কারণে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয় এবং কোয়ারেন্টাইন ও লকডাউনব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষাসামগ্রীর সংকট ও পরবর্তী সময়ে মানহীন সুরক্ষাসামগ্রী সরবরাহে বিপুলসংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হয় এবং যা চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সংকট সৃষ্টি করে।

লকডাউনের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণ এবং মাঠপর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রণোদনা প্রকল্প একদিকে ব্যবসায়ীবান্ধব ও ঋণভিত্তিক

এবং অন্যদিকে অতিদরিদ্রদের জন্য এই আর্থিক সহায়তা অপ্রতুল। ঋণখেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ তৈরির কারণে এই প্রণোদনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

করোনা মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করা হচ্ছে এবং দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় না নিয়ে এসে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীকে হয়রানি ও নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে, তা প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে উৎসাহ প্রদান করছে।

সুপারিশ

সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক কর্তৃক করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং এই কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো−

১. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিদ্যমান যন্ত্রপাতি ও জনবলের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষার সুবিধা জেলা পর্যায়ে আরও সম্প্রসারণ করতে হবে এবং বিদ্যমান সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. বর্তমানে করোনাভাইরাসের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ হার ও মৃত্যুর সময়ে লকডাউন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হবে। লকডাউন প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরীক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে সংক্রমণের ব্যাপকতার নিরিখে এলাকাভিত্তিক ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে।

৩. করোনাভাইরাস মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. স্বাস্থ্য খাতে জেলা পর্যায়ে সার্বিকভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে (জিডিপির ৫ শতাংশ) এবং স্বাস্থ্য খাতের ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।

৫. স্বাস্থ্য খাতে ক্রয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি রোধে জবাবদিহি নিশ্চিত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. সব পর্যায়ের হাসপাতালে স্ক্রিনিং ও ট্রায়াজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। সম্মুখসারির সব স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্মত সুরক্ষাসামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সমন্বিত চিকিৎসার প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে সরকারি বিধির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সব বেসরকারি হাসপাতালে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সব হাসপাতালে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসার পাশাপাশি অন্যান্য রোগের জন্য নিয়মিত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে। সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসায় অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. ব্যবহৃত সুরক্ষাসামগ্রীসহ চিকিৎসা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

১০. অতিদরিদ্র ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, দিনমজুরদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। চলতি কৃষিঋণ মওকুফ করতে হবে।

১১. ত্রাণ ও সামাজিক সুরক্ষার উপকারভোগীদের তালিকা হালনাগাদ করতে হবে। ত্রাণ বা নগদ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১২. দেশজুড়ে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্য সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. স্বাস্থ্যবিধির সফল বাস্তবায়নে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বিনা মূল্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

১৪. তথ্য প্রকাশ ও তথ্যে প্রবেশগম্যতার সুবিধার্থে ও ম্যানেজমেন্টের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের স্বার্থে গণমাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. ত্রাণবিষয়ক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত জনপ্রতিনিধি যাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে, তাদের আইনগতভাবে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, কোভিড-১৯ টাইমলাইন, বিস্তারিত দেখুন : https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19, (১৬ মে, ২০২০ সংগৃহীত)।

[২] জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি, করোনাভাইরাস রিসোর্স সেন্টার, বিস্তারিত দেখুন : https://coronavirus.jhu.edu/map.html, (১৪ জুন, ২০২০ সংগৃহীত)।

[৩] রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ১৭ মার্চ ২০২০।

[৪] রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ৮ মার্চ ২০২০।

[৫] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বুলেটিন, ১৮ মার্চ, ২০২০।

[৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বুলেটিন, ১৪ জুন, ২০২০।

[৭] ওয়ার্ল্ডোমিটার, ১৪ জুন, ২০২০ সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন : https://www.worldometers.info/coronavirus/

[৮] Mahler, D. G., Lakner, C., Aguilar, R. C., & Wu, H. 2020, April 20. The impact of COVID-19 (Coronavirus) on global poverty: Why Sub-Saharan Africa might be the region hardest hit, ১৪ জুন ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest

[৯] দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৫ মার্চ, ২০২০, "Minimising the economic impact of Coronavirus in

Bangladesh", বিস্তারিত দেখুন : https://tbsnews.net/thoughts/minimising-economic-impact-coronavirus-bangladesh-56449

[১০] প্রথম আলো, 'করোনার কারণে দারিদ্র্য বেড়ে ৩৫ শতাংশ হয়েছে : সিপিডি,' ৭ জুন, ২০২০, https://tinyurl.com/y9w5l8lw

[১১] দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড নিউজ, 'সরকারের ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা ও তার সম্ভাব্য প্রভাব', https://tinyurl.com/yaxtvyvq; প্রথম আলো, 'মনোবল হারাবেন না, দেওয়া হবে বিশেষ সম্মানী : চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রধানমন্ত্রী', বিস্তারিত দেখুন : https://tinyurl.com/y97phs73

[১২] যুগান্তর, 'কৃষিতে ভর্তুকি ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা', বিস্তারিত দেখুন : https://tinyurl.com/yad4gyh3

[১৩] দৈনিক দেশ রূপান্তর, 'সংক্রামক ব্যাধির তালিকাভুক্ত হলো করোনাভাইরাস', ২৪ মার্চ ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.deshrupantor.com/epaper/home/print_version/87230

[১৪] সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮, ধারা ১১ (১) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২, ধারা ২২ (১)।

[১৫] সমকাল, 'রাত ১২টা থেকে ১০ দেশের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ বন্ধ', বিস্তারিত দেখুন : https://samakal.com/bangladesh-others/article/200316119

১৬ প্রথম আলো, 'চীন ছাড়া সব রুটে ফ্লাইট বন্ধ ৭ এপ্রিল পর্যন্ত', বিস্তারিত দেখুন : https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1647509

[১৭] দৈনিক দেশ রূপান্তর, 'হুমকি হয়ে উঠেছেন সোয়া ছয় লাখ বিদেশফেরত', বিস্তারিত দেখুন : https://www.deshrupantor.com/first-page/2020/03/19/205353

[১৮] দৈনিক কালের কণ্ঠ, 'করোনা মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি, স্বাস্থ্য খাতেই দরকার তিন কোটি ডলার', ১ এপ্রিল ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2020/04/01/893271

[১৯] স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ, প্রজ্ঞাপন (৪৫.০০.০০০০.১৪৭.১৬.০০৪.২০-৩২৩), তারিখ : ১৮ এপ্রিল ২০২০।

[২০] প্রথম আলো, 'স্কুল-কলেজে ছুটি ৩০ মে পর্যন্ত', বিস্তারিত দেখুন : https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1654960

[২১] সমকাল, 'করোনায় নিষ্প্রাণ এক নির্বাচনের গল্প', বিস্তারিত দেখুন : https://samakal.com/bangladesh/article/200316000

[২২] বাংলা ট্রিবিউন, 'মুসল্লিদের জন্য মসজিদ উন্মুক্ত', বিস্তারিত দেখুন : https://www.banglatribune.com/national/news/622374/

[২৩] ডয়চে ভেলে, 'করোনায় সংক্রমণ বাড়ছে, শঙ্কাও বাড়ছে', ২০ মার্চ ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.dw.com/bn/-52855854

[২৪] স্বাস্থ্য অধিদপ্তররের প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

[২৫] দৈনিক যুগান্তর, 'করোনাভাইরাসে দেশে আরেকজনের মৃত্যু, সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন শুরু', ২৬ মার্চ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/292894/

[২৬] বণিক বার্তা, 'সংক্রমণ রোধের প্রশিক্ষণ নেই ৮৬ শতাংশ নার্সের', ১১ মে ২০২০, বিস্তারিত দেখুন- https://bonikbarta.net/home/news_description/229371/

২৭ দৈনিক দেশ রূপান্তর, 'উপেক্ষিত পরামর্শকরা', ২৯ মে ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.deshrupantor.com/epaper/home/print_version/97467

[২৮] ওয়ার্ল্ডোমিটার, ১২ জুন, ২০২০ সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ, https://www.worldometers.info/coronavirus/

[২৯] প্রথম আলো, সক্ষমতা থাকলেও করোনায় পরীক্ষা হচ্ছে কম, ১৩ এপ্রিল ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1650534/

[৩০] Dhaka tribune, 'Bangladesh far from reaching mass testing capacity', ২৭ এপ্রিল, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.dhakatribune.com/health/coronavirus/2020/04/27/bangladesh-s-capacity-is-far-cry-from-mass-testing

[৩১] দৈনিক প্রথম আলো, 'সব হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয়নি', ৪ জুন, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://epaper.prothomalo.com//printtextviews.php?id=47359&boxid=806798288&type=img

[৩২] দেশ রূপান্তর, 'মহামারি ঠেকাতে প্রবাসী শিক্ষক-শিক্ষার্থী-গবেষকদের ৮ সুপারিশ', ২৫ মার্চ ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.deshrupantor.com/probash-potro/2020/03/28/207282

৩৩ দৈনিক যুগান্তর, 'করোনায় জটিল রোগের চিকিৎসা : প্রস্তুত নয় ১৭ হাসপাতাল', ২২ এপ্রিল, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/300398/

৩৪ বাংলা ট্রিবিউন, 'ভেন্টিলেটর আনার ঘোষণা আছে, উদ্যোগ নেই', ২৫ এপ্রিল ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.banglatribune.com/others/news/620625/

[৩৫] দ্য ডেইলি স্টার, ১১ জুন ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.thedailystar.net/frontpage/news/-1912405

[৩৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বুলেটিন, ৯ জুন, ২০২০।

[৩৭] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, হেলথ বুলেটিন, ২০১৮।

[৩৮] এন টিভি, অনলাইন নিউজ, ১১ জুন, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.ntvbd.com/bangladesh/-755449

[৩৯] দ্য ডেইলি স্টার, ১১ মে, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.thedailystar.net/-1901494

[৪০] প্রথম আলো, '৮ শতাংশ মানুষ হোম কোয়ারেন্টাইনে', বিস্তারিত দেখুন : https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1646914/

[৪১] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২, ধারা (৪)।

[৪২] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭, (ঢাকা : টিআইবি ২০১৮)।

[৪৩] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, হেলথ বুলেটিন ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন : https://dghs.gov.bd/index.php/en/

[৪৪] দৈনিক কালের কণ্ঠ, 'অবশেষে টিভি চ্যানেলের সংবাদ মনিটরিং সেল বাতিল', ২৭ মার্চ, ২০২০ বিস্তারিত দেখুন : https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/03/27/891157

তৃতীয় অধ্যায়
ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত

বাংলাদেশে বিদেশিদের কর্মসংস্থান
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মনজুর ই খোদা

গবেষণার প্রেক্ষাপট

আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে মূলত শ্রম অভিবাসীর জোগানদাতা হিসেবে পরিচিত হলেও বাংলাদেশেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিদেশি নাগরিক কাজ করেন এবং একইভাবে বাংলাদেশ থেকেও বড় অঙ্কের রেমিট্যান্স দেশের বাইরে পাঠানো হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রায় ৫ থেকে ১০ লাখ বিদেশি কর্মী কর্মরত রয়েছেন এবং প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী তারা প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে বৈধ ও অবৈধ পথে প্রায় ৫ থেকে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে থাকেন।[১]

১৯৭০-এর দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক ছিল, যা ১৯৮০-এর দশকের প্রথমে তৈরি পোশাক এবং পরবর্তী সময়ে ওষুধ, চামড়া, সার, সিমেন্ট, মোবাইল ফোন, বিদ্যুৎ শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে শিল্প ও সেবা খাতের ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়েছে। সত্তরের দশকে বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল ৪৪ শতাংশ, যা ২০১৮ সালে কমে ১৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে সত্তরের দশকে শিল্পের অবদান ছিল ১১ শতাংশ, যা ২০১৮ সালে বেড়ে ৩৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।[২] বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে শিল্পের বিকাশে মূলত ১৯৮০-এর দশকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিদেশি বিনিয়োগবান্ধব বিভিন্ন নীতিগত প্রণোদনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যা বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি কর্মীদেরও আকৃষ্ট করে। বিভিন্ন শিল্পের বিকাশের শুরুর দিকে বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন জনবলের ঘাটতি ছিল, যা বিভিন্ন দেশ থেকে সংশ্লিষ্ট খাতের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী দিয়ে পূরণ করা হয়।[৩]

অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের যুবদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি এবং বাংলাদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেকারত্বের হার ৪৭ শতাংশ।[৪] বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীরা এ দেশের চাকরিপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানে প্রতিযোগিতা বাড়াচ্ছেন ও সুযোগ সংকুচিত করছেন। প্রায় চার দশক আগে বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশের সময় যে বিদেশি কর্মী প্রয়োজন ছিল, বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ। এ ছাড়া বাংলাদেশে বিদেশিদের

---

* ২০২০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক বিবেচনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জসংক্রান্ত বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বিদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসংক্রান্ত বর্তমান গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য বাংলাদেশে বিদেশিদের কর্মসংস্থানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা। এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল–

- বিদেশিদের কর্মসংস্থানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা।
- বিদেশিদের কর্মসংস্থানের কারণ, ধরন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা এবং
- বিদেশিদের নিয়োগ-প্রক্রিয়া, বেতন-ভাতা সম্পর্কিত অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

গবেষণার বিশ্লেষণকাঠামো

বাংলাদেশে বৈধ ভিসায় আসা বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশি নাগরিক এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভিসা ছাড়া অবস্থানরত বিদেশিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ বা বিশ্লেষণ করা হয়নি। এ ছাড়া কূটনীতিক, ধর্মযাজক, গবেষক, ছাত্র, জাতিসংঘ ও তার অঙ্গসংগঠন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত বিদেশি নাগরিক এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নন। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশিদের যেসব বিষয় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা হচ্ছে– বিদেশিদের কর্মসংশ্লিষ্ট খাত ও ব্যাপ্তি, বিদেশিদের নিয়োগের কারণ ও প্রভাব, বিদেশিদের নিয়োগ-প্রক্রিয়া, বিদেশিদের নিয়োগসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের দায়িত্ব ও তাদের সমন্বয়, বিদেশিদের আয়ের পরিমাণ, আয় কর ও রেমিট্যান্স প্রবাহ।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি মূলত একটি গুণবাচক পদ্ধতিনির্ভর গবেষণা। এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিষয়সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান– জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কেন্দ্রীয় শুল্ক গোয়েন্দা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), এনজিওবিষয়ক ব্যুরো, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানি, আইটি কোম্পানি, বিজিএমইএ, বিটিএমএ, বিকেএমইএ, তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান, বায়িং হাউস, বেসরকারি হাসপাতাল, আন্তর্জাতিক এনজিও, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাংবাদিকদের মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বাংলাদেশে বিদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানসংক্রান্ত নীতিমালা, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয় থেকে সংগৃহীত তথ্য ও দলিল এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় এপ্রিল ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিদেশি কর্মীর কর্মসংস্থান : উৎস দেশ ও খাত

প্রায় ৪৪টির বেশি দেশ থেকে আসা বিদেশিরা বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত রয়েছেন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দেশ হচ্ছে– ভারত, চীন, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, নরওয়ে ও নাইজেরিয়া।[৫] তবে বাংলাদেশে বিদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানের খাত সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের ঘাটতি রয়েছে।

বিভিন্ন খাতে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতে কর্মরতদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিদেশি কর্মী কর্মরত রয়েছেন তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইলসংশ্লিষ্ট খাতে। এ ছাড়া সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক এনজিও, চামড়াশিল্প, চিকিৎসাসেবা, হোটেল ও রেস্তোরাঁয় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিদেশি কর্মরত রয়েছেন।[৬]

বিদেশি কর্মী নিয়োগের কারণ ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধনশীল। বিদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারীদের বিবেচনায় বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান শিল্প খাতে দ্রুত পরিবর্তনশীল ও হালনাগাদ প্রযুক্তির স্বয়ংক্রিয় ও ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন স্থানীয় জনবলের ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া তৈরি পোশাক খাতে বায়ার ম্যানেজমেন্টের জন্য যোগাযোগ দক্ষতাসম্পন্ন ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন স্থানীয় জনবলের ঘাটতি রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশি কর্মীর প্রতি স্থানীয় মালিকপক্ষের অকারণ পক্ষপাত রয়েছে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো তাদের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসারে নির্দিষ্ট পদে স্থানীয় জনবলের পরিবর্তে বিদেশি কর্মী নিয়োগ দিয়ে থাকে। এ ছাড়া কারখানাপর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে অনীহা রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয়পক্ষ থেকে কৌশলগত পর্যালোচনার মাধ্যমে খাতভিত্তিক দক্ষ স্থানীয় জনবল নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে।

বিদেশিদের অবস্থান, কর্মসংস্থানসংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিদেশি নাগরিকদের আগমন, অবস্থান ও কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আইন, নীতিমালা ও গাইডলাইন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রধানত যেসব আইন, নীতিমালা ও গাইডলাইন উল্লেখযোগ্য। সেগুলো হচ্ছে বিদেশি নাগরিক সম্পর্কিত আইন, ১৯৪৬, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আইন (সংশোধিত), ২০১৫, বাংলাদেশ ভিসা নীতিমালা (সংশোধিত), ২০০৭, বিদেশি নাগরিক নিবন্ধন বিধিমালা, ১৯৬৬, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ও বিনিয়োগ বোর্ড গাইডলাইন, ২০১১।

বিদেশি নাগরিক সম্পর্কিত আইন, ১৯৪৬-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদেশি নাগরিকের আগমন, অবস্থান ও প্রস্থান সম্পর্কিত সব কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার স্বার্থে সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ভিসা নীতিমালা (সংশোধিত), ২০০৭ অনুসারে যেসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, সেসব দেশের নাগরিকরা আগমনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভিসা সংগ্রহ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ভিসা প্রার্থীর পাসপোর্টে ন্যূনতম ছয় মাসের মেয়াদ থাকতে হবে। বাংলাদেশের ভিসা প্রার্থীদের প্রায় ৩৩ ধরনের ভিসা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে কর্মানুমতি প্রার্থী বিদেশি নাগরিকদের প্রাইভেট ইনভেস্টর (পিআই), এমপ্লয়মেন্ট (ই), এনজিও (এন), খেলোয়াড় বা সংস্কৃতিকর্মী (পি) ভিসা সংগ্রহ করতে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে ল্যান্ডিং পারমিট (এলপি), ই১ (যন্ত্রপাতি/ সফটওয়্যার স্থাপন), জে (সাংবাদিক), এ৩ (দ্বিপক্ষীয়/ বহুপক্ষীয় চুক্তির আওতায় প্রকল্পে নিয়োজিত) ভিসাপ্রাপ্ত বিদেশি নাগরিককে কর্মানুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব ভিসা ব্যতীত অন্য কোনো ভিসায় কাজ করার নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও, পর্যটক ভিসা ও ভিসা অন অ্যারাইভাল নিয়ে এ দেশে বিদেশিরা বিভিন্ন খাতে কাজ করছেন।

বিদেশি নাগরিক নিবন্ধন বিধিমালা, ১৯৬৬ অনুসারে বর্তমানে শুধু ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিকদের ৯০ দিনের বেশি অবস্থানের ক্ষেত্রে আগমনের সাত দিনের মধ্যে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে নিবন্ধিত হতে হয়। তবে কাজের উদ্দেশ্যে আসা সব বিদেশি নাগরিকের যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণের নিমিত্তে এই নিবন্ধনব্যবস্থা সব কর্মোপযোগী ভিসার জন্য কার্যকর করা প্রয়োজন।

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আইন (সংশোধিত), ২০১৫ বিদেশি কর্মীর আয় তার নিজ দেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে থাকে। তবে এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, অধিকাংশ বিদেশি নাগরিক আইন অমান্য করে হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার করে থাকেন। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ অনুসারে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের আয়ের ওপর করহার ৩০ শতাংশ। তবে কূটনীতিক, জাতিসংঘ ও তার অঙ্গসংগঠন এবং দ্বিপক্ষীয়/ বহুপক্ষীয় চুক্তির অধীন প্রকল্পে কর্মরতদের জন্য কর মওকুফ রয়েছে।

বিনিয়োগ বোর্ড গাইডলাইন, ২০১১ অনুসারে বাংলাদেশে বিদেশি কোম্পানির লিয়াজোঁ/ শাখা/ প্রতিনিধি কার্যালয় স্থাপনে অনুমতি দেওয়া হয়। কোনো বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশে কাজ করার ক্ষেত্রে কর্মানুমতি এই গাইডলাইন অনুযায়ী সংগ্রহ করতে হয়। এটি অনুযায়ী কূটনীতিক/ ধর্মযাজক/ গবেষক/ ছাত্র/ বহুজাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের 'কর্মানুমতি'র প্রয়োজন নেই।

বাংলাদেশের শিল্প/ বাণিজ্যিক/ শিক্ষা/ ক্রীড়া/ সরকারি ও বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানে বিদেশি নাগরিক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বা বিনিয়োগকারী হিসেবে বাংলাদেশে অবস্থান করে কাজ করার ক্ষেত্রে 'কর্মানুমতি' গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এই গাইডলাইন অনুযায়ী বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যতীত বিদেশি নাগরিকের জন্য কর্মানুমতি নিরুৎসাহিত করা হবে। পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য বিদেশি কর্মী নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হবে। এ ছাড়া, বেতন-ভাতা সম্পর্কিত বিভ্রান্তি পরিহারের লক্ষ্যে এই গাইডলাইনে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিদেশি কর্মীদের পদমর্যাদা অনুসারে ন্যূনতম বেতনকাঠামো একটি মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করা রয়েছে। তবে এখানে কর্মানুমতি প্রদানের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করা নেই। উল্লিখিত বেতনকাঠামো হালনাগাদ

নেই। একই ধরনের যোগ্যতার ব্যক্তির জন্য দেশভেদে ভিন্ন বেতনকাঠামো নির্ধারণ করা রয়েছে, যা বৈষম্যমূলক।

নিচের সারণিতে বাংলাদেশে বিদেশিদের আগমন, অবস্থান ও কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের তালিকা ও তাদের কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো।

সারণি ১ : বাংলাদেশে বিদেশিদের আগমন, অবস্থান ও কর্মসংস্থানসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ

কর্তৃপক্ষ	দায়িত্ব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	বিদেশি কর্মীর আগমন/ কর্মসংস্থান/ প্রত্যাগমন/ সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি
বিশেষ শাখা, বাংলাদেশ পুলিশ (এসবি)	নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই)	
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	কর্মানুমতি প্রদান/ মেয়াদ বৃদ্ধি করা
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা)	
এনজিওবিষয়ক ব্যুরো	
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	ছাড়পত্র / কর্মানুমতি প্রদান করা
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়	
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ	আয়কর সংগ্রহ/ কর সনদ প্রদান
নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান	বিদেশি কর্মী নিয়োগ

বৈধভাবে বিদেশি কর্মী নিয়োগ-প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে কোনো বিদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের পূর্বশর্ত হচ্ছে কর্মোপযোগী ভিসা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কর্মানুমতি। কোনো প্রতিষ্ঠান বিদেশি নাগরিককে নিয়োগ দিতে চাইলে ওই পদে স্থানীয় প্রার্থী নিয়োগের উদ্দেশ্যে যথাযথ নিয়োগ-প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। কেবলমাত্র স্থানীয় যোগ্য প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে যথাযথ নিয়োগ-প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে বিদেশি নাগরিককে নিয়োগ দেওয়া যায়।

চিত্র ১ : বৈধভাবে বিদেশি নাগরিকের নিয়োগ-প্রক্রিয়ার প্রবাহচিত্র

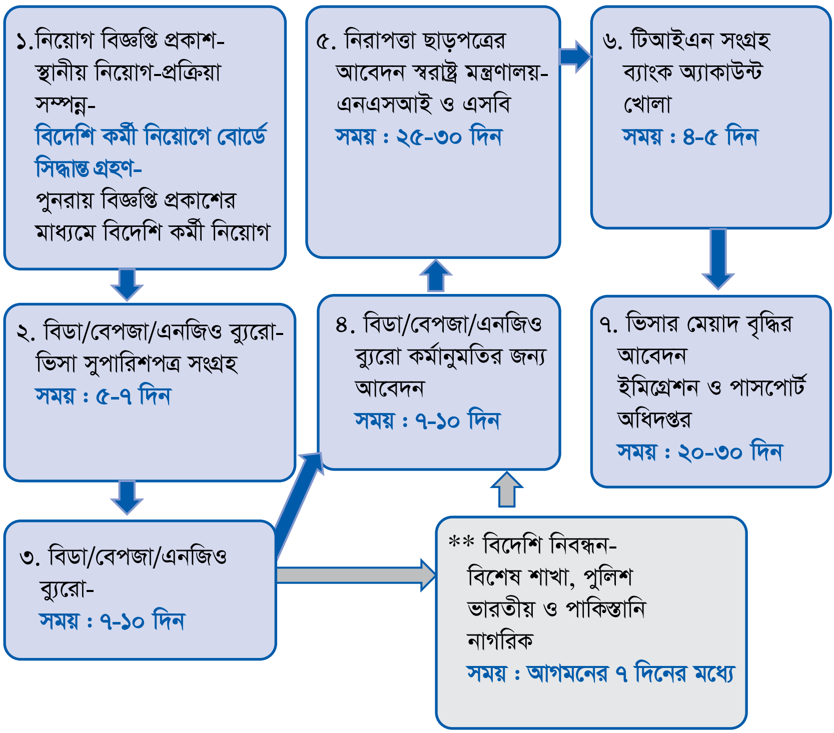

বিদেশি নাগরিকের নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তার ভিসার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভিসা সুপারিশপত্র সংগ্রহ করতে হয়। পরে এই ভিসা সুপারিশপত্রসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য নথিপত্র জমা দিয়ে বিদেশি নাগরিকের নিজ দেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশন থেকে কর্মোপযোগী ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে হয়। বাংলাদেশে আগমনের পরেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে 'কর্মানুমতি'র জন্য আবেদন করতে হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ছাড়পত্রের প্রাপ্তি সাপেক্ষে ওই বিদেশি নাগরিককে নির্ধারিত সময়ের জন্য কর্মানুমতি দেওয়া হয়। কর্মানুমতির মেয়াদ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ভিসার মেয়াদও বৃদ্ধি করে নিতে হয়।

তবে বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, অধিকাংশ বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশে আগমন, অবস্থান ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে না। বাংলাদেশে আগমনের মূল উদ্দেশ্য কর্মসংস্থান হলেও, এ ক্ষেত্রে তারা সাধারণত ট্যুরিস্ট ভিসা বা ভিসা অন অ্যারাইভাল অথবা বিজনেস ভিসায় বাংলাদেশে এসে থাকে। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় নিয়োগদাতাদের যোগসাজশে

কর্মানুমতি ছাড়াই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগ দেন। ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তারা নিজ দেশে বা বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী কোনো দেশে চলে যান এবং পুনরায় একই ধরনের ভিসার জন্য আবেদন করেন।

চিত্র ২ : অবৈধভাবে বিদেশি কর্মীর নিয়োগচক্র

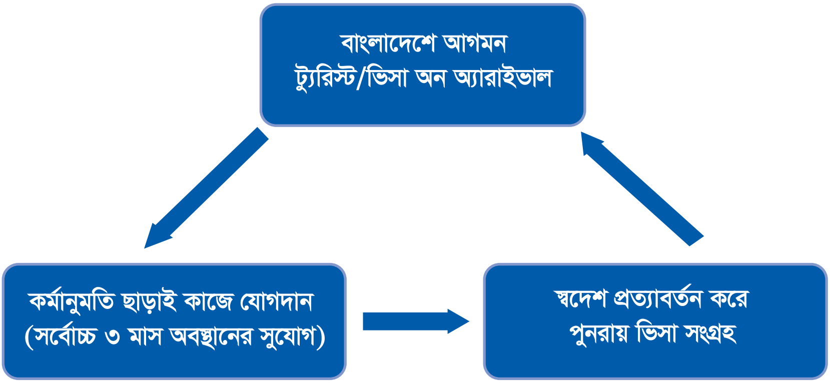

বিদেশি কর্মীর নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় অনিয়ম

বাংলাদেশে বৈধ প্রক্রিয়ায় বিদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। সাধারণত বিদেশি কর্মী নিয়োগের আগে ওই পদে স্থানীয় যোগ্য প্রার্থী খোঁজা হয় না এবং বিদেশি কর্মী নিয়োগ-প্রক্রিয়া অনুসরণের ক্ষেত্রে শুধু নিয়ম রক্ষার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিদেশি কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত পূর্বনির্ধারিত থাকে। বিডা/ বেপজা/ এনজিও ব্যুরোতে ভিসার সুপারিশপত্র এবং কর্মানুমতির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে অনলাইন আবেদনব্যবস্থায় সময়ক্ষেপণের অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভিসার সুপারিশপত্র এবং কর্মানুমতি দ্রুত পাওয়া যায়। সাধারণত শুধু নথি পর্যালোচনার মাধ্যমেই ভিসার সুপারিশ ও কর্মানুমতি দেওয়া হয়, মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন বা পরিবীক্ষণ করা হয় না। উভয় ক্ষেত্রেই নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকেও ট্যুরিস্ট ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে ভিসার সুপারিশপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়াই এমপ্লয়মেন্ট/ বিজনেস ভিসা ইস্যু করার অভিযোগ রয়েছে। কর্মানুমতি প্রদান করার পূর্বশর্ত হিসেবে নিরাপত্তা ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট উভয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া না হলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানে দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ রয়েছে। কর্মানুমতি পাওয়ার পর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

সারণি ২ : বিদেশি কর্মীর নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন

নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের খাত	পরিমাণ (টাকা)
ভিসা সুপারিশপত্র	৫-৭ হাজার
বিদেশে বাংলাদেশ মিশন থেকে ভিসা সংগ্রহ (টি/ই/বি ভিসা)	৪.২৫-৮.৫ হাজার
বিদেশি নাগরিক নিবন্ধন (ভারতীয় ও পাকিস্তানি - ৯০ দিনের অধিক অবস্থানের ক্ষেত্রে)	২-৩ হাজার
কর্মানুমতির জন্য আবেদন (বিডা/ বেপজা / এনজিও ব্যুরো)	৫-৭ হাজার
নিরাপত্তা ছাড়পত্র (এসবি পুলিশ)	৫-৭ হাজার
নিরাপত্তা ছাড়পত্র (জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা)	৩-৫ হাজার
নিরাপত্তা ছাড়পত্র (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)	২-৩ হাজার
ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি (ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর)	৩-৫ হাজার
***মোট**	**২৩-৩৪ হাজার**

* ভিসা সংগ্রহ ও বিদেশি নাগরিক নিবন্ধনে লেনদেনের পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি

বিদেশি কর্মীর নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অনিয়মের মধ্যে কর ফাঁকি, বিদেশি কর্মী নিয়োগের পূর্বশর্ত উপেক্ষা করা, উপযুক্ত ভিসা ও কর্মানুমতি ছাড়াই নিয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট ভিসানীতির লঙ্ঘন অন্যতম। বিদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে দেশি-বিদেশি কর্মীর অনুপাত মানা হয় না এবং একই প্রতিষ্ঠানে একজন বিদেশি কর্মীর সর্বোচ্চ ৫ বছরের বেশি কাজ করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হয় না। সাধারণত আয়কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে বৈধভাবে কর্মরত বিদেশি কর্মীর বেতন প্রাতিষ্ঠানিক নথিপত্রে প্রকৃত বেতন অপেক্ষা কম প্রদর্শিত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত বেতনের এক-তৃতীয়াংশ (প্রায় ৩০ শতাংশ) বৈধভাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় এবং বেতনের বাকি অংশ অবৈধভাবে নগদ দেওয়া হয়ে থাকে। অন্যদিকে অবৈধভাবে কর্মরত কর্মীদের শতভাগ বেতন অবৈধভাবে নগদ অথবা অন্য কোনো দেশের (দুবাই/ সিঙ্গাপুর) ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্মীর নিয়মিত হাতখরচ, আবাসন, পরিবহন ও অন্যান্য সুবিধা দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে বিদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অনিয়ম হচ্ছে ভিসানীতির সরাসরি লঙ্ঘনের মাধ্যমে কর্মোপযোগী ভিসা ছাড়াই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদান। এ ক্ষেত্রে কর্মপ্রার্থী বিদেশি নাগরিক সাধারণত ট্যুরিস্ট বা ভিসা অন অ্যারাইভাল নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। পরবর্তী সময়ে কর্মানুমতি ছাড়াই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে যোগ দেন। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক নথিপত্রে বিদেশি কর্মীর কোনো উল্লেখ থাকে না, তাদের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।

সারণি ৩ : বিদেশি কর্মীর কর ফাঁকি- বেতন কম দেখানো (২০১৮-১৯ অর্থবছর)

কর অঞ্চল-১১তে কর দেওয়া বিদেশি কর্মীর সংখ্যা	৯৫০০ জন
প্রদত্ত আয় করের মোট পরিমাণ (৩০ শতাংশ)	১৮১ কোটি টাকা
সব বিদেশি কর্মীর প্রদর্শিত বার্ষিক আয়ের পরিমাণ	৬০৩ কোটি টাকা
বিদেশি কর্মীপ্রতি গড় মাসিক বেতন	৫৩ হাজার টাকা বা ৬০০ ডলার

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর অঞ্চল ১১-তে মোট ৯ হাজার ৫০০ জন বিদেশি কর্মী আয় কর প্রদান করেন, যার মোট পরিমাণ ছিল ১৮১ কোটি টাকা। মোট আয়ের ৩০ শতাংশ আয়কর হিসেবে ওই অর্থবছরে বিদেশি কর্মীদের মোট আয়ের পরিমাণ হয় ৬০৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ এসব বিদেশি কর্মীর মাসিক গড় বেতন হয় ৫৩ হাজার টাকা বা ৬০০ ডলার। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিদেশি কর্মীদের ন্যূনতম মাসিক গড় আয় ১ হাজার ৫০০ ডলার বা ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা প্রায়। প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ থেকে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী বিদেশি কর্মীদের গড় মাসিক বেতনের পরিমাণ প্রমাণ করে, কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে বৈধ প্রক্রিয়ায় কর্মরত বিদেশি কর্মীদের প্রকৃত বেতন গোপন করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম বেতন প্রদর্শিত হয়।

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীর সংখ্যাসংক্রান্ত বিতর্ক

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। বিভিন্ন গণমাধ্যমে সর্বনিম্ন ২ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ১২ দশমিক ৬ লাখ বিদেশি কর্মীর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।[৭] অপরদিকে, সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীর সংখ্যা মাত্র ৮৫ হাজার ৪৮৬।[৮]

সারণি ৪ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ইস্যুকৃত কর্মোপযোগী ভিসার সংখ্যা, ২০১৮

ভিসার ধরন	সংখ্যা
বি (ব্যবসায়ী)	৯,৬৬১
এ৩ (দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় প্রকল্পে নিয়োজিত)	৩,৫৭৮
ই (এমপ্লয়মেন্ট)	১৮,০২৮
ই১ (যন্ত্রপাতি স্থাপন)	৬৯৫
এন (এনজিও)	৫৪৪
পি (খেলোয়াড় বা সংস্কৃতিকর্মী)	৫৫
পিআই (প্রাইভেট ইনভেস্টর)	৬৪৯
আর (গবেষক)	১৯৫
মোট (ব্যবসায়ী বাদে)	**২৩,৭৪৪**
মোট (ব্যবসায়ীসহ)	**৩৩,৪০৫**

সারণি ৫ : বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কর্মানুমতির সংখ্যা, ২০১৮

কর্তৃপক্ষ	কর্মানুমতির সংখ্যা (নতুন ও নবায়নকৃত)
বিডা	৯,১৪৫
বেপজা	১,৭৩৯
এনজিও ব্যুরো	২৯৬
মোট	**১১,১৮০**

২০১৮ সালে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কার্যালয় থেকে প্রদত্ত কর্মোপযোগী ভিসার মোট সংখ্যা ছিল ৩৩ হাজার ৪০৫টি। অপরদিকে ২০১৮ সালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত মোট কর্মানুমতির সংখ্যা ১১ হাজার ১৮০টি, যা মোট কর্মোপযোগী ভিসার সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। এ ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত কর্মোপযোগী ভিসার সংখ্যার সঙ্গে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কর্মানুমতির সংখ্যার সমন্বয় নেই।

বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধ প্রক্রিয়ায় কর্মরত মোট বিদেশি কর্মীর সংখ্যা প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে– বাংলাদেশে কর্মরত সব বিদেশি নাগরিক ভিসা নিয়ে অবস্থান করেন। তবে অনেকেই যথাযথ কর্মানুমতি নিয়ে কাজ করেন না। যারা কর্মানুমতি ছাড়া কাজ করেন তারা মূলত পর্যটক ভিসা বা ভিসা অন অ্যারাইভাল নিয়ে অবস্থান করেন, যার মেয়াদ সর্বোচ্চ তিন মাস। এ ক্ষেত্রে প্রতি তিন মাস পর তারা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুনরায় পর্যটক ভিসা বা ভিসা অন অ্যারাইভাল নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে আসা পর্যটকের মধ্যে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ কাজের উদ্দেশ্যে আসে। সে ক্ষেত্রে ২০১৮ সালে পর্যটক ভিসার সংখ্যা ছিল ৮ লাখ (প্রাক্কলিত), এর ন্যূনতম ৫০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪ লাখ ভিসা নিয়ে বিদেশি নাগরিক প্রকৃতপক্ষে কাজের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছিলেন। ভিসার সর্বোচ্চ মেয়াদ তিন মাস হওয়ায় বছরে একজন বিদেশিকে (৪/৩/২/১) বা গড়ে ২ দশমিক ৫ বার ভিসা নিতে হয়। এ হিসাবে ২০১৮ সালে পর্যটক ভিসায় অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ১ দশমিক ৬ লাখ। অপরদিকে বৈধভাবে কর্মরত বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা প্রায় শূন্য দশমিক ৯ লাখ বিবেচনায়, বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত সম্ভাব্য মোট বিদেশি কর্মীর সংখ্যা ন্যূনতম ২ দশমিক ৫ লাখ।

বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ প্রাক্কলন

বাংলাদেশ থেকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত রেমিট্যান্সের মোট পরিমাণসংক্রান্ত কোনো নির্ভরযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া না যাওয়ায় বিভিন্ন ধরনের অনুমাননির্ভর ও প্রশ্নবিদ্ধ তথ্য প্রচলিত রয়েছে।

সারণি ৬ : বিভিন্ন সূত্রে উল্লিখিত বাংলাদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ

তথ্যসূত্র	প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ	মন্তব্য
বিভিন্ন গণমাধ্যম	৫-১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত
সাবেক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী (৮ অক্টোবর ২০১৭)	৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত
সাবেক অর্থমন্ত্রী (১৩ মে ২০১৮)	৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত
বিশ্বব্যাংক (২০১৭)	২.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত
বাংলাদেশ ব্যাংক (২০১৭-১৮)	৪৬.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ উপায়ে প্রেরিত ওয়েজ রেমিট্যান্স

উপরিউক্ত সারণি অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত মোট বৈদেশিক আয়ের পরিমাণ ২ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার থেকে সর্বোচ্চ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্রমতে, বাংলাদেশ থেকে বৈধ উপায়ে প্রেরিত ওয়েজ রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের পরিমাণ ৪৬ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলার মাত্র।

বর্তমান গবেষণায় বিদেশি কর্মীর সংখ্যার প্রাক্কলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে প্রেরিত ন্যূনতম রেমিট্যান্স ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তথ্যদাতাদের মতানুসারে, বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের ন্যূনতম মাসিক আয় ১ দশমিক ৫ হাজার মার্কিন ডলার হিসাব করা হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশে কর্মরত মোট বিদেশি কর্মীর ন্যূনতম সংখ্যা প্রাক্কলন করা হয়েছে ২ দশমিক ৫ লাখ। এই হিসাবে বিদেশি কর্মীদের ন্যূনতম মোট বার্ষিক আয় ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট আয়ের ৩০ শতাংশ স্থানীয় ব্যক্তিগত ব্যয় হিসাবে, অবৈধভাবে প্রেরিত ন্যূনতম মোট বার্ষিক রেমিট্যান্সের পরিমাণ প্রায় ৩ দশমিক ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিচের সারণিতে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে প্রেরিত ন্যূনতম রেমিট্যান্স ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণের প্রাক্কলন উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ৭ : বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে প্রেরিত ন্যূনতম রেমিট্যান্স ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ (প্রাক্কলন)

বাংলাদেশে কর্মরত মোট বিদেশি কর্মীর ন্যূনতম সংখ্যা	২ দশমিক ৫ লাখ জন (প্রাক্কলিত)
বিদেশি কর্মী প্রতি ন্যূনতম গড় মাসিক বেতন	১ দশমিক ৫ হাজার মার্কিন ডলার
বিদেশি কর্মীদের ন্যূনতম মোট বার্ষিক আয়	৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
অবৈধভাবে প্রেরিত ন্যূনতম বার্ষিক রেমিট্যান্সের পরিমাণ (৩০ শতাংশ স্থানীয় ব্যয় বাদ দিয়ে)	মোট ৩ দশমিক ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়) (বৈধভাবে শূন্য দশমিক ০৪৬ বি. মার্কিন ডলার + অবৈধভাবে ৩ দশমিক ১ বি. মার্কিন ডলার) ২৬ দশমিক ৪ হাজার কোটি টাকা (প্রায়)*
ন্যূনতম বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ - ৩০ শতাংশ আয়কর	১ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়) ১২ হাজার কোটি টাকা (প্রায়)

* ১ মার্কিন ডলার = ৮৫ টাকা বিনিময়মূল্য হিসাবে প্রাক্কলিত

উপরিউক্ত সারণি অনুসারে, বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২ দশমিক ৫ লাখ বিদেশি কর্মী বছরে ন্যূনতম প্রায় ৩ দশমিক ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২৬ দশমিক ৪ হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে বিদেশে প্রেরণ বা পাচার করেন। অন্যদিকে, প্রকৃত বার্ষিক আয় গোপনের মাধ্যমে এবং অবৈধভাবে বিদেশে পাচারের কারণে বাংলাদেশ সরকারের ন্যূনতম বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১২ হাজার কোটি টাকা।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশি কর্মীর সংখ্যা, দেশ থেকে অবৈধভাবে পাঠানো রেমিট্যান্স ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে বিদেশি কর্মী নিয়োগে কোনো সমন্বিত ও কার্যকর কৌশলগত নীতিমালা নেই। বাংলাদেশে বিদেশি কর্মী নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ নেই, ফলে এসব বিদেশি কর্মী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়হীনতা লক্ষণীয়। মাঠপর্যায়ে বিদেশি কর্মীর বৈধতা পরীক্ষণ ও নজরদারিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর তৎপরতা অনুপস্থিত। বিদেশি কর্মীর আগমন, প্রত্যাগমন ও নিয়োগ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আংশিকভাবে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ লক্ষণীয় এবং বিভিন্ন স্তরে নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

বিদেশি কর্মী নিয়োগের ফলে স্থানীয় প্রার্থীরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন এবং নির্দিষ্ট পদে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় বিদেশি কর্মী নিয়োগের কারণে বেতন-ভাতা বাবদ রাষ্ট্রের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয়। বিদেশি কর্মীর প্রকৃত সংখ্যা ও অবৈধভাবে পাচারকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য নেই। বর্তমান গবেষণার প্রাক্কলন অনুযায়ী, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীর ন্যূনতম সংখ্যা প্রায় ২ দশমিক ৫ লাখ, অবৈধভাবে পাচারকৃত রেমিট্যান্সের ন্যূনতম বার্ষিক পরিমাণ প্রায় ২৬ দশমিক ৪ হাজার কোটি টাকা এবং কর ফাঁকির কারণে ন্যূনতম বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা।

সুপারিশ

১. বাংলাদেশে বিদেশি কর্মীর নিয়োগে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একটি সমন্বিত কৌশলগত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

২. বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের সব তথ্য কার্যকর উপায়ে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সুবিধার্থে সব আগমন ও প্রত্যাগমন পথে সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্যবিনিময়ের সুযোগ থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে–

   ক. বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোকে প্রতি মাসেই ইস্যুকৃত ভিসার শ্রেণি অনুযায়ী বিবরণী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে;

   খ. বাংলাদেশের ‘পোর্ট অব এন্ট্রি’, যেমন বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরে অবস্থিত ইমিগ্রেশন অফিসকে বিদেশিদের আগমন ও নির্গমন তালিকা প্রতি মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং

   গ. ‘ভিসা অন অ্যারাইভাল’ সংখ্যা সমন্বয়ের জন্য দূতাবাস প্রেরিত তালিকা ও বিমান বা স্থলবন্দরে ইমিগ্রেশন অফিস প্রেরিত তালিকার সমন্বয় করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক আসা সব বিদেশির একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৩. বিদেশি কর্মীদের ভিসা সুপারিশপত্র, নিরাপত্তা ছাড়পত্র, কর্মানুমতি ও ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিসংক্রান্ত সেবা প্রদানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. বিদেশি কর্মীদের ন্যূনতম বেতনসীমা হালনাগাদ করতে হবে।

৫. বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি মিশনে ভিসা প্রদানে অনিয়ম বন্ধ করতে হবে– মেশিন রিডেবল ভিসা ব্যতীত অন্যান্য প্রক্রিয়ায় ভিসা (সিল) প্রদান বন্ধ করতে হবে।

৬. বিদেশি কর্মীদের তথ্যানুসন্ধানে বিভিন্ন অফিস বা কারখানায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিডা ও পুলিশের বিশেষ শাখার সমন্বয়ে নিয়মিত যৌথ টাস্কফোর্স কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

৭. খাতভিত্তিক বিদেশি কর্মীর চাহিদা নিরূপণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিদেশি কর্মী নিয়োগের পূর্বশর্ত যথাযথভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. শিল্প খাতের বিকাশের সুফল গ্রহণে স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৯. অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প খাতভিত্তিক স্থানীয় মানবসম্পদের দক্ষতা ও যোগ্যতার উন্নয়নে নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] *নিউ এজ*, 'ফরেন ন্যাশনালস ওয়ার্কিং ইলিগ্যালি গো আনচেকড', ১০ মার্চ ২০১৮, http://www.newagebd.net/article/ 36422/foreign-nationals-working-illegally-go-unchecked (১৯ ডিসেম্বর ২০১৯)।

[২] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ, ২০১৮*, https://mof.gov.bd/site/page/44e399b3-d378-41aa-86ff-8c4277eb0990/BangladeshEconomicReview (২২ ডিসেম্বর ২০১৯)।

[৩] কে এম আনওয়ারুল ইসলাম, ২০১৪, 'ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই) ইন বাংলাদেশ : প্রসপেক্টস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ইটস ইমপ্যাক্ট অন ইকোনমি', *এশিয়ান বিজনেস রিভিউ*, এশিয়ান বিজনেস কনসোর্টিয়াম, ভল. ৪(১), পৃ. ২৯; https://abc.us.org/ojs/index.php/abr/article/view/70/143 (২২ ডিসেম্বর ২০১৯)।

[৪] এফ খাতুন এবং এস ওয়াই সাদাত, ২০১৮, *দি ইগনোরড জেনারেশন : এক্সপ্লোরিং দি ডিনামিকস অব ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট ইন বাংলাদেশ*, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ এবং সিটিজেনস প্ল্যাটফর্ম ফর এসডিজিস, বাংলাদেশ; http://www.fes-bangladesh.org/files/daten/Publications/The-Ignored-Generation-Exploring-the-dynamics-of-youth-employment-in-Bangladesh.pdf (৩১ ডিসেম্বর ২০১৯)।

[৫] দৈনিক ইনকিলাব, 'দেশে কর্মরত সাড়ে ৮৫ হাজার বৈধ বিদেশির ৬৮ হাজার ব্যবসায়ী', ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, https://www.dailyinqilab.com/article/115899 (২০ নভেম্বর ২০১৯)।

[৬] *দ্য ডেইলি স্টার*, 'ফরেন ওয়ার্কার্স ট্যাক্স ইভেশন', ৫ অক্টোবর ২০১৭, https://www.thedailystar.net/business/foreign-employees-the-rise-bangladesh-194584 (২০ নভেম্বর ২০১৯); *ঢাকা ট্রিবিউন*, 'ইলিগ্যাল ফরেন ওয়ার্কার্স অ্যান্ড ট্যাক্স ইভেশন হার্টিং বাংলাদেশ ইকোনমি', ৪ এপ্রিল ২০১৮, https://www.dhakatribune.com/opinion/special/2018/04/04/illegal-foreign-workers-tax-evasion-hurting-bangladesh-economy (২০ নভেম্বর ২০১৯)।

[৭] *দ্য ডেইলি অবজারভার*, '১২.৬ লাখ ফরেনার্স স্টে ইলিগ্যালি ইন বাংলাদেশ', ১৬ এপ্রিল ২০১৬, https://www.observerbd.com/2016/04/16/146878.php (২০ নভেম্বর ২০১৯); *দ্য ডেইলি স্টার*, 'ফরেন এমপ্লয়িজ অন দ্য রাইজ ইন বাংলাদেশ', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫, https://www.thedailystar.net/business/foreign-employees-the-rise-bangladesh-194584 (২০ নভেম্বর ২০১৯); *দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, 'নিড ফর অথেনটিক ডেটা অন ফরেন ওয়ার্কার্স', ২৬ জুন ২০১৮, https://thefinancialexpress.com.bd/views/need-for-authentic-data-on-foreign-workers-1530029764 (২০ নভেম্বর ২০১৯); *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, 'বাংলাদেশে ১০ লাখ অবৈধ বিদেশি', ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯, https://www.bd-pratidin.com/first-page/2019/09/29/461172 (২০ নভেম্বর ২০১৯)।

[৮] *দ্য ডেইলি স্টার*, '৮৫,৪৮৬ ফরেনার্স ওয়ার্কিং লিগ্যালি', ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, https://www.thedailystar.net/city/85486-foreigners-working-legally-1529971 (২০ নভেম্বর ২০১৯)।

গবেষক পরিচিতি

অমিত সরকার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিদ্যা ও পুলিশবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ থেকে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিতে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থা (জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ), মানব পাচার, সাইবার ও বহুজাতিক অপরাধ ইত্যাদি।

আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রায়োগিক কাজের মাধ্যমে তিনি উন্নয়ন গবেষক ও মূল্যায়নকারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। তিনি উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় (যেমন সরকারি সেবা ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার, নারী ও যুবদের কার্যকর নাগরিক হিসেবে তৈরি, সামাজিক জবাবদিহি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, এনজিও খাতে সুশাসন, কমিউনিটি পর্যায়ে আইনগত সহায়তা, পানি-স্যানিটেশন-স্বাস্থ্যবিধি, টেকসই চিংড়ি চাষ ইত্যাদি) নিয়ে গবেষণা, মূল্যায়ন, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করেছেন। জুয়েল মিয়া টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ব্র্যাকে কর্মরত।

জুলিয়েট রোজেটি

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান (সংসদ), তথ্য অধিকার এবং সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত।

নাহিদ শারমীন

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার

প্রধান বিষয় হচ্ছে স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান, সরকারি ক্রয়, জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্য খাত ও প্রতিষ্ঠান।

নিহার রঞ্জন রায়

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নিহার রঞ্জনের গবেষণার প্রধান বিষয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান (সংসদ) এবং ভূমি খাত (ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম)। এ ছাড়া তিনি সমবায় খাত (সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা) এবং পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস নিয়েও গবেষণা করেছেন।

তাসলিমা আক্তার

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য খাত ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সঙ্গেও তিনি জড়িত।

ফাতেমা আফরোজ

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সিভিল সার্ভিস কলেজ থেকে গভর্নেন্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং ভিয়েনাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-করাপশন একাডেমিতে মাস্টার অব আর্টস ইন অ্যান্টি-করাপশন স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে সুশাসন, দুর্নীতি, জাতীয় সংসদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জেন্ডার ইত্যাদি।

ফারহানা রহমান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া তিনি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা, ২০০৪ সালের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত।

মনজুর ই খোদা

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন।

তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের স্থল ও সমুদ্রবন্দর এবং কাস্টম হাউস ব্যবস্থাপনা, বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক শিক্ষা খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন।

মো. জুলকারনাইন

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং পরে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে জনস্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যাংকিং খাত এবং এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন জরিপের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। টিআইবি ছাড়াও তিনি পপুলেশন কাউন্সিল বাংলাদেশ, জেমস পি. গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন।

মো. মোস্তফা কামাল

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি আইসিডিডিআরবিতে স্বাস্থ্য খাতের একাধিক গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন।

মো. শহিদুল ইসলাম

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং একই বিভাগ থেকে 'মিলিটারি রুল অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস অব গুড গভর্নেন্স : আ স্টাডি অব এরশাদ রেজিম' বিষয়ে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে 'উন্নয়ন পরিকল্পনার' ওপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করছেন। তার গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে সুশাসন, উন্নয়ন, গণতন্ত্র, জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। টিআইবি ছাড়াও তিনি ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগে কাজ করেছেন।

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, জাতীয় সততাব্যবস্থা ও এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

মোরশেদা আক্তার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে জাতীয় সংসদ, শিক্ষা খাত, সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত।

শাম্মী লায়লা ইসলাম

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে জাতীয় সততাব্যবস্থা, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘ সনদ ও এর প্রয়োগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা ইত্যাদি। বর্তমানে তিনি ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালে কর্মরত।

শাহজাদা এম আকরাম

সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, নির্বাচনব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, জাতীয় সততাব্যবস্থা ও এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং শ্রম অভিবাসন।

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নাগরিক চাহিদাকে সোচ্চার ও কার্যকর করার জন্য কাজ করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য টিআইবি গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোতে প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক অবকাঠামো সুদৃঢ় করা ও এর প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে ‘বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক ১০টি সংকলন ইতিমধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের একাদশতম সংকলন ২০২১ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। এই সংকলনকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে– প্রথম অধ্যায়ে দেশের শুদ্ধাচারব্যবস্থা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার ওপর ভিত্তি করে লিখিত সারসংক্ষেপ ও প্রবন্ধসমূহ সংকলিত হয়েছে।

978-984-34-9992-9